বিজ্ঞান (www.bigyan.org.in) – এর কিছু
বাছাই লেখার সংকলন

বিজ্ঞান পত্রিকা

তৃতীয় সংখ্যা | এপ্রিল ২০১৬

পদার্থবিদ্যার কিছু বিস্ময়

কণা পদার্থবিদ্যার জগত:
বিজ্ঞানীরা যখন ডিটেকটিভ

আকাশজুড়ে এই আঁধারে

জীবন বিজ্ঞান

ম্যালেরিয়া : নোবেল পুরস্কার
এবং মানুষের ভবিষ্যৎ

প্রযুক্তি বিজ্ঞান

অ্যাস্ট্রোস্যাট :
জ্যোতির্বিদ্যার জগতে ভারতের
অনন্য অবদান

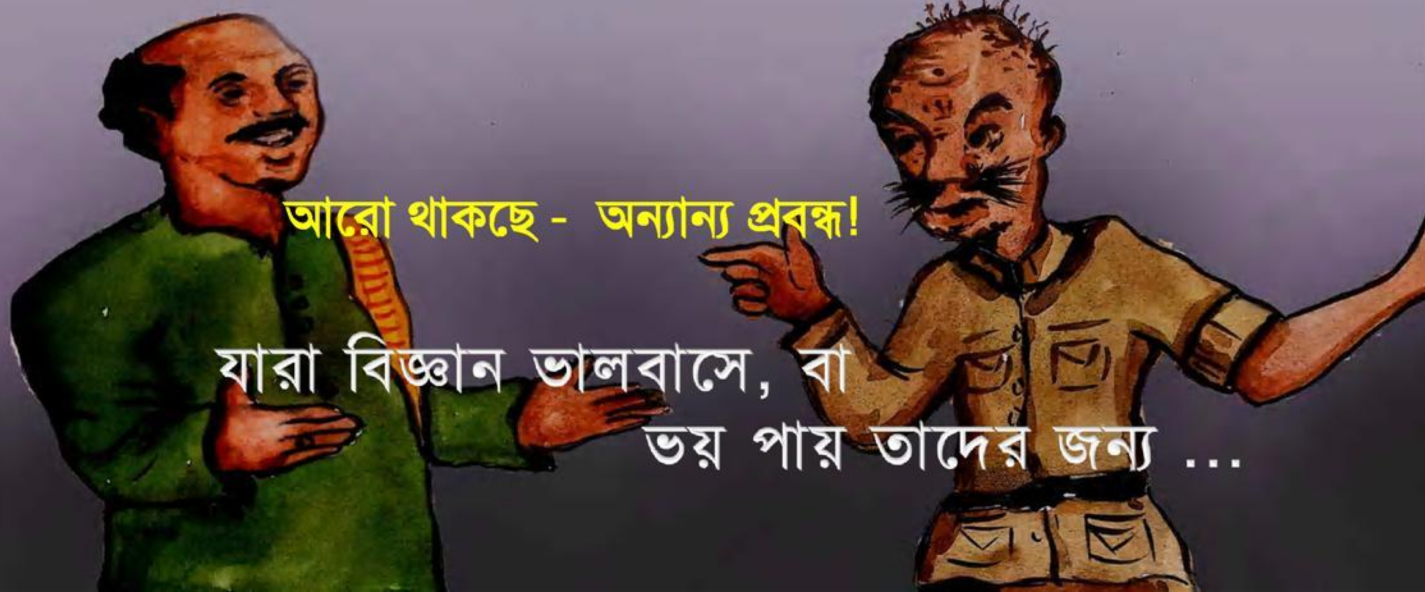

বিজ্ঞান পত্রিকা

তৃতীয় সংখ্যা
এপ্রিল, ২০১৬

www.bigyan.org.in-এর বাছাই করা লেখার সংকলন

'বিজ্ঞান' সম্বন্ধে জানতেঃ

ওয়েবসাইট - www.bigyan.org.in
ফেসবুকের পাতা - https://www.facebook.com/bigyan.org.in

ইমেইল - bigyan.org.in@gmail.com

সূচীপত্র

জোনাকি আলোকে ০৬
- পদক্ষেপ স্বেচ্ছাসেবী

আকাশজুড়ে এই আঁধারে ০৯
- সুপ্রতীক পাল

ছদ্মবেশী ১৯
- অনিন্দিতা ভদ্র

কণা পদার্থবিদ্যার জগত: বিজ্ঞানীরা যখন ডিটেকটিভ ২২
- অর্ক সাঁতরা

অ্যাস্ট্রোস্যাট : জ্যোতির্বিদ্যার জগতে ভারতের অনন্য অবদান ২৭
- মৈয়াঙ্ক ভাহিয়া

ম্যালেরিয়া : নোবেল পুরস্কার এবং মানুষের ভবিষ্যৎ ৩৩
- সুমন্ত দে

অঙ্কের যুবরাজ ৪০
- বেদদ্যুতি চক্রবর্তী

সম্পাদকীয়

'বিজ্ঞান পত্রিকা'-য় আমরা 'বিজ্ঞান'-এ প্রকাশিত লেখাগুলোর মধ্যে কিছু পছন্দের লেখা তুলে আনি। এর আগে 'বিজ্ঞান পত্রিকা'-র দু'টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে। আমরা জেনে আনন্দিত এবং উৎসাহিত হয়েছি যে এই পত্রিকাটি বেশ কিছু স্কুল তাদের রীডিং বোর্ডের মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে পৌঁছে দিচ্ছে। এইসব স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ। 'বিজ্ঞান' ও 'বিজ্ঞান পত্রিকা'-র অন্যতম উদ্দেশ্য হল ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে সহজভাবে আধুনিক বিজ্ঞানের কিছু দিক তুলে ধরা। আশা রাখি, লেখাগুলি পড়ে উৎসাহিত হয়ে পাঠকদের অনেকে ভবিষ্যতে বিজ্ঞান গবেষণার জগতে পা রাখবে। তবে বিজ্ঞান পড়ার উদ্দেশ্য শুধু ভবিষ্যতে গবেষণার জগতে যাওয়ার মধ্যেই সীমিত নয়। বিজ্ঞান সচেতনতা সমাজের প্রতিটি মানুষের থাকা উচিত।

বিগত দুই সংখ্যার সম্পাদকীয়তে 'বিজ্ঞান' ও 'বিজ্ঞান পত্রিকা'-র উদ্দেশ্য নিয়ে আলোচনা করেছিলাম। এই সংখ্যার সম্পাদকীয়তে আমরা 'বিজ্ঞান'-এর সম্পাদনা এবং কার্যপ্রণালী নিয়ে আলোকপাত করবো। 'বিজ্ঞান'-এর লেখাগুলো সম্পাদনা করতে গিয়ে বুঝেছি যে সহজ কিন্তু সঠিকভাবে বিজ্ঞান লেখা বেশ শক্ত। প্রচলিত খবরের কাগজে বিজ্ঞানের যে খবরগুলো লেখা হয় তার অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় সবার জন্য সহজ করে লিখতে গিয়ে হয়েছে মহা বিপত্তি! অলঙ্কারে এমন ঠেসে গেছে লেখা যে আসল রূপটি আর চেনা যাচ্ছে না। পাঠকের পড়তে হয়ত বেশ ভাল লাগল, কথায় কথায় 'আইনস্টাইন', 'মহাবিশ্বের রহস্য' এসব অনেকবার পাওয়া গেল – কিন্তু ঠিক বিজ্ঞানের বিষয়টা বোধগম্য হল না! অনেকক্ষেত্রে আবার পাঠক এই অলঙ্কারকেই লেখার মূল বিষয়বস্তু ভাবার ভুল করে।

এক জ্বলন্ত উদাহরণ হল সম্প্রতি কণা পদার্থবিদ্যার এক সাড়া জাগানো আবিষ্কার। ফ্রান্স ও সুইজারল্যান্ডে অবস্থিত সার্ণ (CERN)-এর পরীক্ষাগারে হিগস বোসন নামে এক কণার অস্তিত্ব জানা গেছে, যার খোঁজ চলছিল বহুদিন। এই কণাটিকে আবার অনেকে 'গড পার্টিকেল' বা 'ঈশ্বর কণা' নাম দিয়েছেন। শোনা যায় যে এক গবেষক একটা বইতে একে 'গডড্যাম পার্টিকেল' (Goddamn Particle) নাম দিয়েছিলেন, যার বাংলা করা যেতে পারে 'হতচ্ছাড়া কণা' বা 'বিচ্ছু কণা'। কিন্তু বইয়ের প্রকাশক ভাষাটিকে ভদ্র করে 'গড পার্টিকেল' করে দিলেন, আর অমনি দশচক্রে বিচ্ছু ভগবানে পরিণত হল! রসিকতা করে হিগস পার্টিকেল-কে গড পার্টিকেল বললে আপাতভাবে ক্ষতি হয়ত হয় না, কিন্তু অনেকের সাথে কথা বলতে গিয়ে আমরা দেখেছি যে তারা এই ভগবানের উপমাটা বেশ আক্ষরিক অর্থেই গ্রহণ করেছেন। এখানে 'বিজ্ঞান'-এর এক সম্পাদকের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা প্রাসঙ্গিক। একটি স্কুল সেমিনারে মূল বক্তৃতার আগে ছাত্রছাত্রীরা তাদের মাষ্টারমশায়ের সাহায্যে বানানো হিগস কণা আবিষ্কারের উপর একটা বক্তৃতা দিচ্ছিল। সেই বক্তৃতার প্রথম অংশ ছিল - ভারতীয় দর্শনে ভগবানের ভূমিকা!

'বিজ্ঞান'-এর লেখাগুলি ছাপার সময় আমরা এইসব বিষয়ে সতর্ক থাকি। লেখাগুলি সাধারণত তারাই লেখেন যারা সেই বিষয় নিয়ে গবেষণা করেছেন বা অন্য গবেষকদের কাজ কাছ থেকে দেখেছেন। তাই সহজ করে বলতে গিয়ে ভুল করে ফেলবেন না এমনটি আশা করা যায় লেখকদের কাছ থেকে। তার উপরে, প্রথাগত গবেষণার জগতে ব্যবহৃত কিছু পদ্ধতি আমরা গ্রহণ করেছি 'বিজ্ঞান'-এর লেখাগুলো সম্পাদনার কাজে। যেমন, 'Peer-reviewing'। বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান পদ্ধতির নৈতিকতা (ethics) ও অখণ্ডতা (integrity) ধরে রাখার

জন্য এই ধাপটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। গবেষণার জগতের ‘peer review’ মডেল অনুযায়ী আমরা যে কোনো নতুন লেখা পাবার সাথে সাথেই সেই বিষয়ক সম্পাদকমণ্ডলীর কাছে পাঠাই। প্রথমে নজর দেওয়া হয় লেখাটির বৈজ্ঞানিক গুণগত মান নিয়ে। প্রয়োজনে সম্পাদকমণ্ডলীর বাইরে বিশেষজ্ঞদেরও পরামর্শ নেওয়া হয়। এই সম্পাদক বা অতিরিক্ত বিশেষজ্ঞদের (অর্থাৎ reviewer-দের) মতামতের ভিত্তিতে লেখক লেখাটি পরিমার্জনা করেন। Reviewer-রা ছাড়পত্র দেবার পরে লেখাটি যায় আর এক অতিরিক্ত সম্পাদকের কাছে যে ভাষার গুণগত মানের দিকটা দেখে। আমাদের এই peer-review পদ্ধতি সময়সাপেক্ষ, অনেক ক্ষেত্রেই লেখা জমা পড়া থেকে প্রকাশনা হতে কয়েক মাস সময় লেগে যায়। গবেষণার জগতে কিছু ক্ষেত্রে (যেমন গণিতশাস্ত্রে) এই পদ্ধতিটি সম্পূর্ণ করতে অনেক সময় চার-পাঁচ বছর-ও লেগে যায়।

এভাবে আমরা চেষ্টা করি যাতে ‘বিজ্ঞান’-এ প্রকাশিত লেখাগুলো বৈজ্ঞানিক দিক থেকে সঠিক এবং সেই সাথে সহজপাঠ্য হয়। আমাদের আশা ‘বিজ্ঞান’-এর লেখাগুলোর মধ্যে আমাদের এই পরিশ্রম ও উৎসাহের ফল আপনারা দেখতে পাবেন।

এই সংখ্যায় আমরা হাজির হয়েছি সাতটি লেখা নিয়ে। আমরা প্রায় প্রত্যেকেই ছোটোবেলায় জোনাকির আলো দেখে বিস্মিত হয়েছি। সেই জোনাকির আলোর বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা নিয়ে হাজির “জোনাকি আলোকে”। মহাবিশ্বের সিংহভাগ উপাদান নাকি চোখে দেখা যায় না বা পরীক্ষায় ধরা পড়ে না। বিজ্ঞানীদের পোষাকি ভাষায় একে “Dark matter” ও “Dark energy” বলে। সেই নিয়েই আমাদের দ্বিতীয় লেখা “আকাশজুড়ে এই আঁধারে”। বিবর্তনের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া কিছু উদ্ভিদের বিস্ময়কর অভিযোজনের নিদর্শন নিয়ে লেখা “ছদ্মবেশী”। চতুর্থ লেখাটি হিগস বোসন এবং কণা পদার্থবিদ্যার গল্প নিয়ে। সম্প্রতি ভারতের মহাকাশ বিষয়ক গবেষণা সংস্থা ISRO অ্যাস্ট্রোস্যাট নামে একটি কৃত্রিম উপগ্রহ পাঠিয়েছে এবং মহাকাশ গবেষণায় এর গুরুত্ব অসীম। সেই নিয়েই আমাদের পরের লেখা। ম্যালেরিয়া বিষয়ক গবেষণার জন্য ২০১৫ সালে চিকিৎসা শাস্ত্রে নোবেল পুরস্কার পান ইয়ুউয়ু টু। সেই গবেষণার কাহিনী রয়েছে “ম্যালেরিয়া: নোবেল পুরস্কার এবং মানুষের ভবিষ্যৎ”-এ। প্রতি বছর ২২ সে ডিসেম্বর “জাতীয় গণিত দিবস” (National Mathematics Day) উৎযাপিত হয় ভারতীয় গণিতজ্ঞ রামানুজন-এর স্মৃতিতে। তাঁকে নিয়ে আমাদের শেষ লেখা “অঙ্কের যুবরাজ”।

আশা করি সবকটি লেখাই আপনাদের ভালো লাগবে। অনুরোধ রইলো নিজে পড়ুন এবং চারপাশের লোককে পড়ান।

সম্পাদকমণ্ডলী, ‘বিজ্ঞান’
২৩ এপ্রিল, ২০১৬

‘বিজ্ঞান’-এর সম্পাদনায় যারা আছি

- কুণাল চক্রবর্ত্তী (ন্যাশনাল সেন্টার ফর বায়োলজিক্যাল সায়েন্সেস, ব্যাঙ্গালোর)
- কাজী রাজীবুল ইসলাম ((ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি এবং হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় , কেমব্রিজ, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র)
- দিব্যজোতি ঘোষ (অ্যাডোবি, সান হোসে, ক্যালিফোর্ণিয়া, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র)
- অনির্বাণ গঙ্গোপাধ্যায় (ম্যাথওয়ার্কস, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র)
- অর্ণব রুদ্র (ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র; NGO পদক্ষেপ-এর সদস্য)
- অর্ণব রুদ্র (ট্রিনিটি কলেজ, কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়, ইংল্যান্ড; NGO পদক্ষেপ-এর সদস্য)
- শাওন চক্রবর্তী (হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়)
- সুমন্ত্র সরকার (ব্র্যান্ডাইস ইউনিভার্সিটি, ম্যাসাচুসেটস)
- আবির দাস (ব্র্যান্ডাইস ইউনিভার্সিটি, ম্যাসাচুসেটস)
- কাজী ফারহা ইয়াসমিন (আই বি এম, কলকাতা)
- সূর্যকান্ত শাসমল (কগনিজেন্ট, কলকাতা)

‘বিজ্ঞান পত্রিকা’-র সম্পাদনা - সূর্যকান্ত, অর্ণব, অনির্বাণ, কুণাল ও রাজীবুল।

প্রচ্ছদ ও পত্রিকার নকশা - সূর্যকান্ত

জোনাকি আলোকে

পদক্ষেপ স্বেচ্ছাসেবী

ও জোনাকী, কী সুখে ওই ডানা দুটি মেলেছ।
আঁধার সাঁঝে বনের মাঝে উল্লাসে প্রাণ ঢেলেছ॥
তুমি নও তো সূর্য, নও তো চন্দ্র, তোমার তাই ব'লে কি কম আনন্দ।
তুমি আপন জীবন পূর্ণ ক'রে আপন আলো জ্বেলেছ॥
তোমার যা আছে তা তোমার আছে, তুমি নও গো ঋণী কারো কাছে,
তোমার অন্তরে যে শক্তি আছে তারি আদেশ পেলেছ।
তুমি আঁধার-বাঁধন ছাড়িয়ে ওঠ, তুমি ছোটো হয়ে নও গো ছোটো,
জগতে যেথায় যত আলো সবায় আপন ক'রে ফেলেছ॥"

- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

("জোনাকী" বানান অপরিবর্তিত)

বিশ্ববিদ্যালয়ের চত্বরে এমনি ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম সন্ধ্যেবেলা। অন্ধকার করে এসেছে। ইটের বাঁধানো রাস্তার দুপাশে টিম টিম করে জ্বলছে শ'য়ে শ'য়ে জোনাকি। যেন আকাশের তারারা সবাই মাটিতে নেমে এসেছে। বড় স্নিগ্ধ মায়াময় তাদের আলো। মনে হচ্ছে আমি চলেছি এক স্বপ্নলোকের দিকে। আর ওরা যেন আমায় পথ দেখিয়ে নিয়ে চলেছে। এত জোনাকি বহুদিন দেখিনি। অন্ধকারের মধ্যে যেন ওরা আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। হাঁটু মুড়ে বসলাম জোনাকিদের পাশে। অন্ধকারের ঘন

চাদর যেন আরও ঢেকে গেল চারদিকে। ওদের মধ্যে কেউ কেউ আমার মাথায়, হাতে বসতে শুরু করলো, সম্পূর্ণ উদাসীন আমার অস্তিত্বে।

"জোনাকি, কোথা থেকে পেলে এমন মায়াভরা আলো?" ওদেরকেই যেন জিগ্যেস করলাম।

"আমাদের মধ্যে কিছু রাসায়নিক বস্তু আছে, যা থেকে এমন আলো বেরোয়, তোমার ভালো লেগেছে?" চমকে উঠলাম। জোনাকি আমার সাথে কথা বলছে নাকি? বিশ্বাস হলো না। আশেপাশে তাকালাম, কেউ তো নেই। কে কথা বলল তাহলে?

"তাহলে তোমরাই আমায় বলো কি রাসায়নিক পদার্থ আছে তোমাদের মধ্যে?" গল্প জুড়ে দিলাম ওদের সাথে।

"জোনাকি লুসিফেরিন (firefly luciferin) বলে একরকম যৌগপদার্থ আছে যা লুসিফারেজ (luciferase) বলে এক উৎসেচকের সাহায্যে এটিপি (ATP = adenosine triphosphate) এবং অক্সিজেনের উপস্থিতিতে ডাইঅক্সিটেন (dioxetane) গোত্রের যৌগ তৈরি করে। তারপর স্বতঃস্ফূর্তভাবে কার্বন ডাইঅক্সাইড তৈরি করে আর তার সঙ্গে তৈরি করে অক্সিলুসিফেরিন (oxyluciferin)। এই অক্সিলুসিফেরিন উত্তেজিত অবস্থায় সবজে-নীল আলো বিকিরণ করে তারপর শান্ত হয়।" জোনাকি এক নিশ্বাসে কথাগুলো বলে দম নিল।

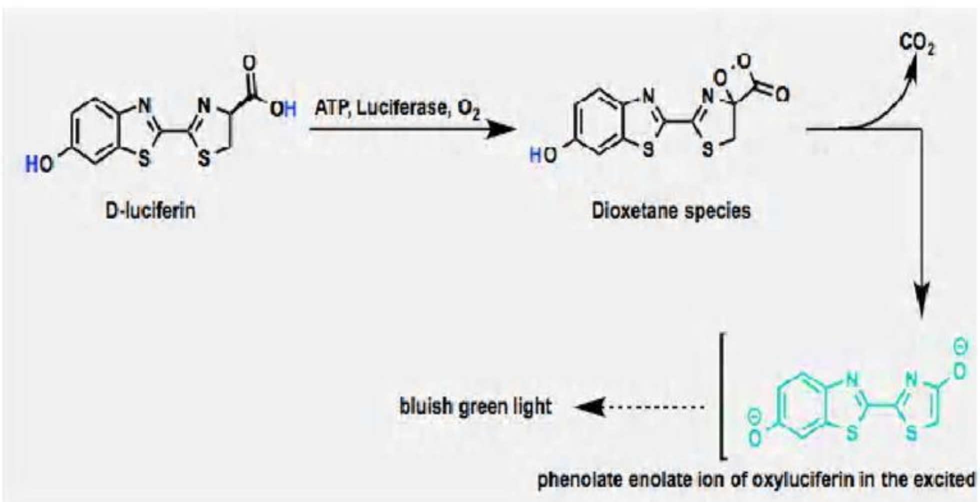

ডি লুসিফেরিন-(D-Luciferin) এটিপি ও অক্সিজেনের উপস্থিতিতে লুসিফারেজের সঙ্গে জোট বেঁধে ডাইঅক্সিটেন গোত্রের অণু তৈরি করে যা কার্বন ডাইঅক্সাইড তৈরি করে আর তার সঙ্গে তৈরি করে অক্সিলুসিফেরিন। এই অক্সিলুসিফেরিন উত্তেজিত অবস্থায় সবজেনীল আলো বিকিরণ - করে। নীল রঙের হাইড্রোজেন পরমাণুগুলো অক্সিজেনের সঙ্গে লেগে থাকতে পারে আবার নাও পারে।

আমি তো অবাক। জিগ্যেস করতেই যাচ্ছিলাম যে ওরা এত জানলো কি করে? এর মধ্যে একটা গাড়ি চলে এলো তার উগ্র হেডলাইট জ্বালিয়ে। জোনাকিরা যেন কোথায় মিলিয়ে গেল। আমার মন খারাপ হয়ে গেল।

"এদিক ওদিক দেখছ কেন? আমরাই তো কথা বলছি তোমার সাথে", হাতের ওপরে বসা জোনাকি কথা বলে উঠলো। আমি স্বপ্ন দেখছি নিশ্চয়। ভাবলাম যতক্ষণ এই স্বপ্ন চলে ততক্ষণই ভালো।

"কি রে শান্তনু, এখানে কি করছিস? মোল্লা নাসিরুদ্দিনের মত হারানো চাবি খুজছিস নাকি? চল, বাড়ি চল।" দীপঙ্করের বিরক্তিকর গলা ভেসে এলো।

"তোর কাজই হলো সব কিছু পণ্ড করা।" বিরক্তি নিয়েই উঠে বসলাম ওর গাড়িতে। বললাম ওকে এতক্ষণ যা হলো। এর পর যা হলো তা তো আপনারা আন্দাজ করতেই পারেন। আমার মানসিক অবস্থা নিয়ে ব্যঙ্গ চলল কিছুক্ষণ। তবে দীপঙ্কর ছেলেটা ভালো আর একজন রসায়নবিদ হওয়াতে এসব ভালই জানে, তাই আমাকে কিছু ইতিহাসও শুনিয়ে দিল।

"আরে জানিস তো জন্স হপকিন্স বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই বিজ্ঞানী, জীববিদ্যার উইলিয়াম ম্যাকেলরয় আর রসায়নের এমিল হোয়াইট দুজনে মিলে জোনাকির আলো (bioluminescence) নিয়ে অনেক কাজ করেছেন বিংশ শতাব্দীর পঞ্চাশ-ষাটের দশকে। ম্যাকেলরয় তো লোকজনকে পাঠাতেন জোনাকি ধরে আনার জন্য। উনি লুসিফারেজের ওপর অনেক কাজ করেছেন। আর এমিল হোয়াইট প্রথম লুসিফেরিনের গঠন আবিষ্কার করেন এবং তাঁর রসায়নাগারে সেই অণুটি তৈরিও করেন।" গাড়ির মধ্যে অন্ধকারেও বেশ বুঝলাম দীপঙ্করের চোখ উৎসাহে জ্বলজ্বল করছে।

কদিন পরে এই নিয়ে একটু পড়াশোনা করতে গিয়ে দেখলাম ভারতের গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ডঃ বড়ুয়া ও তাঁর ছাত্র জোনাকির মধ্যে অক্সিজেনের সর্বক্ষণ উপস্থিতি সুনিশ্চিত করে তার আলো জ্বালিয়ে রেখেছেন। ভেবে দেখো যদি এরকম আলো অনেক বড়মাপে তৈরি করা যায় তাহলে রাস্তার পাশে লাগিয়ে রাখলে আর পথবাতি (street light) দরকার পড়বে না।

পরের দিনেই দেখলাম মার্কিনদেশে ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজিতে কিছু বিজ্ঞানী আলো বিকিরণ করে এমন গাছ বানিয়ে ফেলেছেন আর সেটা তারা নাকি এই বছরের শেষে বিক্রিও করবেন। আমি তো এখনি একখানা চেয়ে রেখেছি।

অতিরিক্ত তথ্য ও রেফারেন্সের জন্য দেখুন http://bigyan.org.in/2014/08/04/jonaki-aloke/

(লেখাটি ৪-ঠা অগাস্ট ২০১৪ তারিখে প্রকাশিত হয়েছিল)।

প্রচ্ছদের ছবি তুলেছেন অশ্বিন শেঠি

পদক্ষেপ (http://padakshep.org/) একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা যা পশ্চিমবঙ্গের দুঃস্থ মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের সাহায্য করে।

আকাশজুড়ে এই আঁধারে

সুপ্রতীক পাল

অধ্যাপক, ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিসটিকাল ইনস্টিটিউট

এই যে প্রফেসর নিধিরাম পাটকেল, সেই যে সেবার "**মহাবিশ্বের প্রথম আলো**"* নিয়ে গল্প টল্প বলে গেলেন। আর তো আপনার ছায়ারও দর্শন মেলা ভার!

আরে রোসো। গিয়েছিলাম এই আলো নিয়ে কালোয়াতি করতেই। তা কি আর চাট্টিখানি কথা?

খাসা বলেছেন মশাই। আলো নিয়ে কালোয়াতি! তা কি পেলেন মশাই এই আলো নিয়ে কাল্টিভেট, মানে, কালোয়াতি করে?

কি পেলাম? পেলাম এই যে, সূর্য-তারা-গ্রহ-নক্ষত্র-ছায়াপথ যা কিছু আমরা দেখছি তা এই মহাবিশ্বের মাত্র চার শতাংশ জুড়ে আছে।

এ তো আপনি গতবারেই বললেন মশাই। মনে না থাকলে আর একবার না হয়-"মহাবিশ্বের প্রথম আলো" পড়ে নেওয়া যাবে 'খন। তাহলে আর নতুন কী গল্প বলবেন এবারে?

বলব বলব। তার আগে বলুন তো, আপনাকে বেশ চেনা চেনা লাগছে। হুমমম... ঠিক ধরেছি। "কাল্টিভেট" শুনেই কেমন একটা সন্দেহ হচ্ছিল। দ্য গ্রেট জটায়ু, মানে শ্রী লালমোহন গাঙ্গুলী না?

হে হে... ধরেই যখন ফেলেছেন, তখন গল্পটা শুরু করা যাক।

* 'বিজ্ঞান'-এ প্রকাশিত (http://bigyan.org.in/2015/06/22/first-light/)

তা বেশ। এবারের গল্পটা ওই বাকি ৯৬ শতাংশ নিয়ে।

ও, আপনার সেই দুই মক্কেল - ডার্ক ম্যাটার আর ডার্ক এনার্জি?

ঠিক ধরেছেন। তাহলে শুরু থেকে শুরু করা যাক, কি বলেন?

সে তা আর বলতে? শুভস্য শীঘ্রম।

চলুন তাহলে একলাফে পৌঁছে যাই ১৯৩০ এর শুরুর দিকে। কয়েকজন পাগল...

কি মুস্কিল ! ছিল তো মহাকাশ, আবার পাগল কোথা থেকে এলো?

আসে আসে। জানতি পারেন না। এইসব পাগলদের একটা গালভরা নাম আছে - আপনারা বলেন বিজ্ঞানী। তো এই উর্ট, জুইকি, স্মিথরা করছিলেন কী, ছায়াপথগুলোকে নিয়ে একটু খেলাধূলা করছিলেন। ছায়াপথ তো আপনি দিব্যি বোঝেন। নামটা হয়ত শোনেন নি, এই যা। ইংরেজিতে একে বলে গ্যালাক্সি (Galaxy)।

বিলক্ষণ, এই তো একটা আমার পকেটেই আছে !

এই তো মশাই, উটের পাকস্থলী হয়ে গেল! এনাকে রাখতে গেলে আপনার পকেটটা একটু বেশীই বড় হতে হবে আর কী! এই আমাদের সূর্য যেমন একটা নক্ষত্র, এরকম লক্ষ লক্ষ নক্ষত্র নিয়ে তৈরী হয় এক একটা ছায়াপথ, অর্থাৎ আসল Galaxy। দেখতে অনেকটা এই রকম :

এই গ্যালাক্সির তাত্ত্বিক নাম NGC 5457। চিত্রের উৎস Astrophysical Journal (2011) 733: 124

সব্বাই ঠিক এরকম দেখতে না, তবে এই ভদ্রলোক আমাদের এই গল্পে বেশ প্রাসঙ্গিক। এঁর কথায় একটু পরে আবার আসব।

বলেন কী? লক্ষ লক্ষ নক্ষত্র নিয়ে একটামাত্র ছায়াপথ!

হ্যাঁ। আর এরকম লক্ষ লক্ষ ছায়াপথ নিয়ে একটা ক্লাস্টার। আর লক্ষ লক্ষ ক্লাস্টার নিয়ে আমাদের এই মহাবিশ্ব।

বুঝলাম। আচ্ছা, তাহলে ঐ বিজ্ঞানীরা ঠিক কী করছিলেন?

ঠিকঠাক বলতে গেলে ওঁরা মাপছিলেন ক্লাস্টারের মধ্যে ছায়াপথগুলোর গতিবেগের তারতম্য (velocity dispersion)। আরে আরে ঘাবড়াবেন না, আপনি প্রশ্ন করলেন বলেই না বললুম। মোদ্দা কথা এই গতিবেগের তারতম্য থেকে হিসেব করে ফেলা যায় ক্লাস্টারটির মোট ভর।

ওহ, ভর? এই যেমন আমার হল গিয়ে আড়াই সের?

ঠিক। আর এই করতে গিয়েই বাধল গোল। দেখা গেল ক্লাস্টারের মধ্যে যা কিছু আমরা দেখতে পাই - কেবল খালি চোখে না, টেলিস্কোপের সাহায্যেও - তাদের ভর যোগ করলে দাঁড়ায় ক্লাস্টারের মোট ভরের (যা ওই গতিবেগের তারতম্য থেকে মাপা হয়েছে) মাত্র একের পাঁচ ভাগ। অর্থাৎ বাকি প্রায় চারের পাঁচ ভাগ চোখের সামনে থেকে বেমালুম লোপাট!

বলেন কী মশাই! এ তো রীতিমতো সাহারায় সীতাহরণ, থুড়ি, শিহরণ !

তবে আর বলছি কী! তা জুইকি ছিলেন এমনিতেই একটু খ্যাপাটে স্বভাবের। মাঝে মাঝেই অদ্ভুত সব আইডিয়া নিয়ে আসতেন। দুম করে বলে বসলেন এর পেছনে আছে এক ছুপা রুস্তম, যাকে আমরা ধরতে পারি নি এখনো। স্বভাবে আমাদের দৃশ্য বস্তুর মতই। তফাৎটুকু শুধু এই যে, চোখের সামনে দেখা দিচ্ছে না। আকাশজুড়ে আঁধার। আর একইরকম দুম করে এর নাম দিয়ে বসলেন ডার্ক ম্যাটার। তা জুইকিকে মশাই কেউই প্রথম ধাক্কায় বিশ্বাস করতে চায়নি, ওনার ঐ অদ্ভুত সব আইডিয়ার জন্যই।

সেই তো। আমারও তো কেমন জানি অদ্ভুত লাগছে। আছে কিন্তু দেখা দিচ্ছে না! কিছু একটা ভুলচুক তো হলেও হতে পারে। সে আপনার ক্লাস্টারটি ভূতুড়েই হোক বা বিজ্ঞানীদের হিসেবের ভুলই হোক।

দিব্যি বলেছেন। তাহলে শুনুন। ক্লাস্টারটি ভূতুড়ে নয় তার প্রমাণ হল, এখনো অব্দি যতগুলো ক্লাস্টার নিয়ে বিজ্ঞানীরা নাড়াচাড়া করেছেন, তাদের সবার ক্ষেত্রেই ঐ চারের পাঁচ ভাগ ডার্ক ম্যাটার না থাকলে তাদের মোট ভর কিছুতেই মিলবে না। ঐ চারের পাঁচ ভাগই - সব্বার ক্ষেত্রে।

আচ্ছা, তা না' হয় মানলাম। কিন্তু এমনও তো হতে পারে, যে বিজ্ঞানীরা সব ক্লাস্টারের ক্ষেত্রে হিসেবে ঠিক একই গড়বড় করছেন?

তা পারে। তবে আমি যদি বলি, এই ডার্ক ম্যাটার মহাশয় নাক গলান শুধু ক্লাস্টারেই নয়, ক্লাস্টারগুলো যাদের দিয়ে তৈরী, সেই ছায়াপথ বা গ্যালাক্সির কাজকারবারেও। এমনকি, এই পুরো মহাবিশ্বের বিবর্তনেও। তখন?

কিরকম কিরকম? এবার তো মনে হচ্ছে ব্যাপারটা হাইলি সাসপিশাস!

তাহলে খুলেই বলি। আর তার জন্য আগেই যে ছায়াপথের সাথে আপনার সাক্ষাত হলো, ঐ আগের ছবিতে যাকে দেখা যাচ্ছে, তিনিই যথেষ্ট। এরকম ছায়াপথকে বলে স্পাইরাল গ্যালাক্সি (spiral galaxy)। আমাদের সূর্য যে ছায়াপথের অংশ, সেই মিল্কি ওয়ে-ও এরকমই একটি স্পাইরাল গ্যালাক্সি।

তা ছায়াপথ তো ছায়াপথ, তা স্পাইরাল হল, না উল্টোনো ঘটির মত হল, তাতে কি এসে যায় মশাই?

যায় বৈকি। এই স্পাইরাল গ্যালাক্সিগুলোর অদ্ভুতত্ব হল, এদের এক্কেবারে ভেতরটা গোল বলের মত, যার মধ্যে বেশিরভাগ নক্ষত্ররা বাস করে। আর বাইরে ইয়া লম্বা লম্বা যে লেজগুলো বেরিয়ে আছে দেখছেন, এগুলো মূলত হাইড্রোজেনের মেঘ দিয়ে গড়া। দূর থেকে দেখতে একটা চ্যাপ্টা থালার মত লাগে আর কী। এই অব্দি তো ঠিকই ছিল। বিপত্তি সেই হাইড্রোজেনের গতিবেগ মাপতে গিয়ে।

হাইড্রোজেনের আবার গতিবেগ? সেটা কি ব্যাপার মশাই?

মহাবিশ্বের সবই যে নৃত্যের তালে তালে। পৃথিবী ঘুরছে সূর্যের চারপাশে, আপনিও সাথে ঘুরছেন। আবার চাঁদ ঘুরছে পৃথিবীর চারপাশে। কিভাবে আর কেন ঘোরে, তাও তো আপনি দিব্যি জানেন সেই দত্ত-পাল-চৌধুরীর আমল থেকেই।

এ হে হে, সে তো পড়েছিলাম মশাই গড়পার রোডের বারান্দায় রোদ পিঠ করে।

ওতেই হবে। কেন ঘোরে বলুন দেখি?

এই ইয়ে, মানে, মহাকর্ষ বল - যা কিনা কেন্দ্রের দিকে কাজ করে, আর কেন্দ্রাতিগ বল (centrifugal force) - যা কিনা বাইরের দিকে কাজ করে, তারা টাগ-অফ-ওয়ারের খেলায় একে অন্যকে কাটাকুটি করে ফেলে, তাই...

হাইড্রোজেনের মেঘগুলোর ক্ষেত্রেও ঠিক তাই। এরা ঐ দুই বলের কাটাকুটির ফলে স্পাইরাল গ্যালাক্সির কেন্দ্রের চারপাশে গোল করে ঘুরতে থাকে। আর তাই যদি হয়, ঐ দুটো বলের কাটাকুটির হিসেব থেকে আপনি দিব্যি বলে দিতে পারবেন কেন্দ্র থেকে কত দূরে হাইড্রোজেনের মেঘের গতিবেগ কেমন হবে।

ভাই তপেশ, আমার উনত্রিশ নম্বর উপন্যাস...

থাক, বুঝেছি। হিসেব করলেই দেখবেন, কেন্দ্র থেকে যদ্দুর অব্দি বেশির ভাগ নক্ষত্র থাকে, মানে ঐ গোল বলের মত অংশটা, তদ্দুর অব্দি বেগ বাড়বে। আর তার বাইরে - যেখানে প্রায় আর নক্ষত্র নেই, খালি হালকা হাইড্রোজেনের মেঘ - সেখানে মহাকর্ষও আর হু হু করে বাড়বে না, কাজেই গতিবেগ ঝুপ ঝুপ করে কমতে থাকবে।

তা অবিশ্যি জলের মত পরিষ্কার। গোল্লার বাইরে কে-ই বা আর ওকে বেগ দেবে? বাইরেটা তো প্রায় ফাঁকা - মানে শূন্য!

খাঁটি কথা। অর্থাৎ স্বাভাবিক হিসেব অনুযায়ী দূরত্বের সাথে বেগ কেমন হবে তা দেখতে লাগবে এই ছবির নিচের রেখার (expected from luminous disk) মত। তাই না?

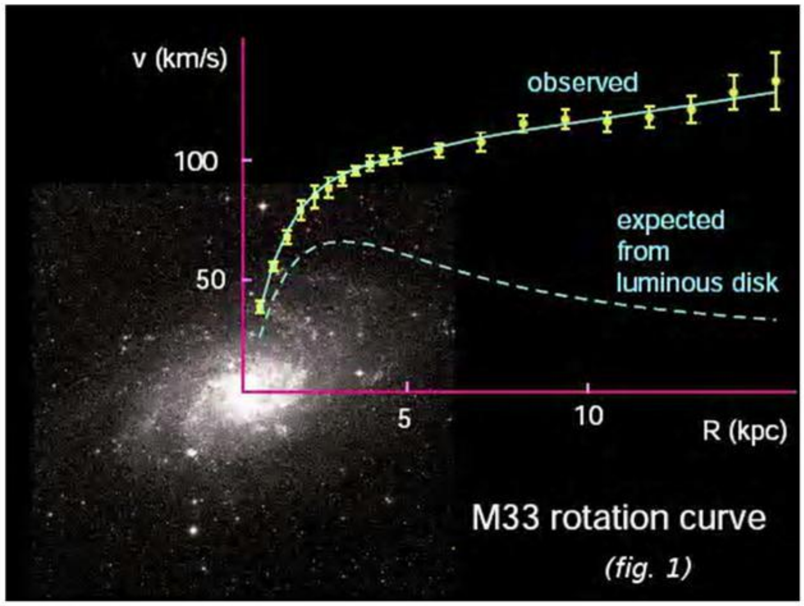

গ্যালাক্সি M33-র থেকে পাওয়া যায় এই প্লট। চিত্রের ঋণস্বীকার MNRAS (2000) 311: 441

ঠিক তাই।

এইবার সামলান মশাই মগনলাল মেঘরাজের মস্করা। মেপে দেখা গেল, বাইরের দিকেও হাইড্রোজেনের মেঘগুলোর বেগ কিন্তু কমছে না। প্রায় একই থাকছে। এই ছবির ওপরের রেখা (observed) থেকেই তা বোঝা যায়।

কেলেঙ্কারিয়াস কান্ড মশাই! কী করে সম্ভব? গোল্লার বাইরে তো সামান্য হাইড্রোজেনের মেঘ ছাড়া আর কাউকে দেখা যাচ্ছে না? কেউ না থাকলে বাড়তি বেগটা দেবে কে?

ভাবুন ভাবুন....

তাহলে কি যাদের আপাতত দেখা যাচ্ছে না, সে-ই ডার্ক ম্যাটার?

কেল্লা ফতে! সেই আগের দুর্ধর্ষ দুশমন। তারা স্পাইরাল গ্যালাক্সিকে বাইরের থেকে গোল করে ঘিরে রেখেছে আর হাইড্রোজেনের মেঘগুলোকে ঠেলে ঠেলে গতিবেগ বাড়িয়ে দিচ্ছে। এরা ঠিক কতটা পরিমাণে আছে, তারও হিসেব করে ফেলা যায় খুব সহজেই - ঐ প্রায় পাঁচ ভাগের চার ভাগ।

এ তো সেই ক্লাস্টারে যতটা আছে বলে হিসেব, প্রায় ততটা!

তবে আর বলছি কী? মজার ব্যাপার হল, এখন অব্দি হাজারেরও বেশি স্পাইরাল গ্যালাক্সিতে পাওয়া গেছে এই একই ধাঁচ। এছাড়াও আছে বুলেট ক্লাস্টার, লেনসিং ইত্যাদির মত ঘটনা। সব ব্যাপারে বিশদ বলার সুযোগও নেই। মোটামুটি ভাবতে পারেন এই ভদ্রলোক বিশ্বের বহু ঘটনাতেই নাক গলান।

তাহলে তো মশাই এই মক্কেলকে সিরিয়াসলি নিতেই হচ্ছে! কিন্তু এই যে আপনি বললেন, লক্ষ লক্ষ ছায়াপথ নিয়ে ক্লাস্টার তৈরী হয়, আর লক্ষ লক্ষ ক্লাস্টার নিয়ে আমাদের মহাবিশ্ব। তাহলে মহাবিশ্বেও তো ডার্ক ম্যাটারের ছড়াছড়ি থাকা উচিত। দেখি, এই ল্যাংমুচ্কির প্যাঁচ সামলাবেন কিভাবে!

বেশ, দেখুন। হিসেব বলে, খালি চোখে আর নানান টেলিস্কোপের সাহায্যে আমরা যে আমাদের চারপাশে আজকের বিশ্ব দেখছি, এই বিশ্বটা এই মুহূর্তে ঠিক এই রকম, তার কারণ মহাবিশ্বের প্রায় ২৩-২৬ শতাংশ হল ডার্ক ম্যাটার। এর একটু বেশি বা কম হলেই আজকের এই বিশ্বটা ঠিক এরকম দেখতে হত না।

কী আশ্চর্য! এখানেও সেই ডার্ক ম্যাটার!

তবে আর বলছি কী?

কিন্তু এই যে বললেন, ছায়াপথ আর ক্লাস্টারের মধ্যে তিনি প্রায় পাঁচ ভাগের চার ভাগ? হিসেব করলে তো দাঁড়ায় আশি শতাংশ !

যথার্থ প্রশ্ন। এই আশি শতাংশ কার? মোট পদার্থের – যাকে বলে ম্যাটার । ঐ যে বলেছিলাম, যা কিছু দৃশ্যমান তা মোটামুটি ৪ শতাংশ। এই ৪ আর ২৩-২৬ মিলিয়ে ২৭-৩০ শতাংশ হলো বিশ্বের মোট পদার্থ। এবার হিসেব করুন তো মশাই ২৭ এর মধ্যে ২৩ বা ৩০ এর মধ্যে ২৬ কত শতাংশ হয়?

কিমাশ্চর্যমতঃপরম !

বিশ্বাস হল তো মশাই?

বিলক্ষণ। কিন্তু এই ডার্ক ম্যাটারকে ধরার কোনো উপায় কি নেই?

নিশ্চই আছে। তিনি এখন অব্দি আমাদের সাথে লুকোচুরি খেলছেন এই যা। মানে মহাকর্ষীয় গুণাগুণ সব রকমই দেখাচ্ছেন, কিন্তু ধরতে গেলেই আর ধরা দিচ্ছেন না। খানিকটা খুড়োর কলের মতন। তবে বিজ্ঞানীরাও ছাড়বার পাত্র নন। লড়ে যাচ্ছেন পরীক্ষাগারে, আবার মহাকাশেও। তাঁদের আশা একদিন না একদিন এই মক্কেল ধরা দেবেনই।

কিন্তু এ তো গেল সাকুল্যে মহাবিশ্বের ২৭-৩০ শতাংশ। বাকি প্রায় ৭০ শতাংশ? যা নাকি আবার পদার্থও নয়?

এই ৭০ শতাংশ হলো ডার্ক এনার্জি – যার জন্য আমাদের বিশ্ব এই মুহূর্তে শুধু বেলুনের মত ফুলছেই না, লাফিয়ে লাফিয়ে ফুলছে, মানে ফোলার বেগ সময়ের সাথে বেড়ে চলেছে বা ত্বরান্বিত হচ্ছে।

কী মুস্কিল! আপনিই তো বলেছিলেন মহাবিশ্বের সৃষ্টি ১৩৮০ কোটি বছর আগে। তখন আপনি কোথায় ছিলেন মশাই, যে জানলেন?

কী করে জানলাম? ঐ যে বলেছিলাম, আজকের দিনে দাঁড়িয়েও আলো ধরার কল বানিয়ে, অর্থাৎ কিনা টেলিস্কোপ দিয়ে, জানা যায় পুরনো ইতিহাস। ঘটে কী, এই বিশ্ব নিরন্তর ফোলার জন্য, যে আলো যত দূর থেকে আসে, তার তরঙ্গদৈর্ঘ্য তত বদলে গিয়ে আমাদের টেলিস্কোপে ধরা দেয়। এই তরঙ্গদৈর্ঘ্য বদলানোর ঘটনাকে বলে রেডসিফট (redshift)। অর্থাৎ যে আলো ধরে আমরা যত পুরনো সময়কে দেখতে চাইব, এই রেডসিফেটর পরিমাণ তার ক্ষেত্রে তত বেশি হবে। এই রেডসিফট সঠিকভাবে মাপা যায় টেলিস্কোপ দিয়ে। আর তার থেকে হিসেব কষে আজকের দিনে বসেও জানা যায় আমাদের বিশ্ব কোন সময় কিরকম ভাবে ফুলেছে।

আশ্চর্য ব্যাপার মশাই। আজকের দিনে বসেই!

হুম। কিন্তু একটা কথা আপনি হিসেব না-কষেই কিন্তু বলে দিতে পারবেন। পদার্থ মাত্রেই একে অন্যকে আকর্ষণ করে, এ তো আপনি নিউটনের মহাকর্ষ সূত্র থেকেই জানেন – সেই দত্ত-পাল-চৌধুরীর আমল থেকেই। কাজেই এটাও দিব্যি বুঝছেন, আমাদের এই মহাবিশ্ব-বেলুনটা যত ফুলবে, তত তাকে আরো আরো জোরে ফুলিয়ে দিতে হলে লাগবে আকর্ষণের উল্টো বল, অর্থাৎ বিকর্ষণ। তা তো মশাই কোনোরকম পদার্থই দিতে পারবে না।

হাঁ, এ আর এমন কী কথা...

তাহলে এটা মানবেন, যে আমাদের এই বিশ্ব যদি শুধুমাত্র পদার্থ দিয়ে তৈরী হত, তবে তার ফোলার গতিবেগ সময়ের সাথে ধীরে ধীরে কমে আসার কথা। ঠিক যেন বুড়ো বিশ্ব আর কী!

স্বাভাবিক। কিন্তু এই যে বললেন আজকের বিশ্ব লাফিয়ে লাফিয়ে ফুলছে !

সেটাই তো আসল মজা। তাহলে, আপনি যা আশা করছিলেন, তা মিলল না। তাই তো? তাহলে খুলেই বলি। ১৯৯৮ সালে প্রথম এক বিশেষ ধরণের সুপারনোভা – যাদের পোশাকি নাম সুপারনোভা টাইপ ওয়ান এ- (SNIa) – এরা দিল ভারি অদ্ভুত তথ্য। নাম শুনে ঘাবড়ানোর কিছু নেই। সহজ কথায় নক্ষত্রদের মৃত্যুকালের এক দশা হল সুপারনোভা। তা এই বিশেষ সুপারনোভাগুলো থেকে মেপে ফেলা যায় ওদের লুমিনোসিটি (luminosity) বা দীপ্তি। আর সেখান থেকে এক বিশেষ রকমের দূরত্ব, যার নাম লুমিনোসিটি ডিসটেন্স (luminosity distance) বা দীপ্তি দূরত্ব। ব্যাস, আর কী? এবার চটপট হিসেব কষে বলে ফেলা যায় ঠিক কত রেডসিফটে সুপারনোভাটির দীপ্তি দূরত্ব কত ছিল। আর ঐ যে বললাম, এর থেকে হিসেব করে আজকের দিনে বসেও জানা যায় আমাদের বিশ্ব কখন কিরকম ভাবে ফুলছে।

পুরোপুরি বুঝলাম না। কিন্তু একটা ধারণা তৈরী হল।

এইটুকু জানলেই হবে, ব্যাস। তা জানা গেল অদূর অতীতে, যখন কিনা আমাদের বিশ্বের আয়তন ছিল আজকের আয়তনের মোটামুটি ৬০ শতাংশ, তখন থেকে এই বিশ্ব লাফিয়ে লাফিয়ে ফুলতে শুরু করেছে। অর্থাৎ যদিও

আমরা ভাবছিলাম আজকের বিশ্বের ফোলার বেগ ধীরে ধীরে কমে আসার কথা, আসলে ঘটছে ঠিক তার উল্টো। শুনেই তো গেল গেল রব।

কেন কেন?

একটু আগেই তো দেখলাম, বিশ্ব-বেলুনটাকে আরো জোরে ফুলিয়ে দেওয়ার জন্য লাগবে বিকর্ষণ বল, যা কিনা কোনো রকম পদার্থই দিতে পারে না।

তাহলে কে সেই মক্কেল, যে এরকম অদ্ভুতভাবে ফুলিয়ে দিচ্ছে বিশ্বকে? তার তো চাই অনেক অনেক ঠ্যালা দেওয়ার ক্ষমতা, মানে বাইসেপ্স ট্রাইসেপ্স কুয়াড্রু...

হ্যাঁ, বিজ্ঞানের ভাষায় সেই মক্কেলের থাকতে হবে বিপুল পরিমাণে বহির্মুখী চাপ, যার সাহায্যে তিনি দেবেন এই বিকর্ষণ। এনার নাম দেওয়া হল ডার্ক এনার্জি। আর তিনি কতটা থাকবেন তার হিসেবও করা হল। মহাবিশ্বের প্রায় ৭০ শতাংশ।

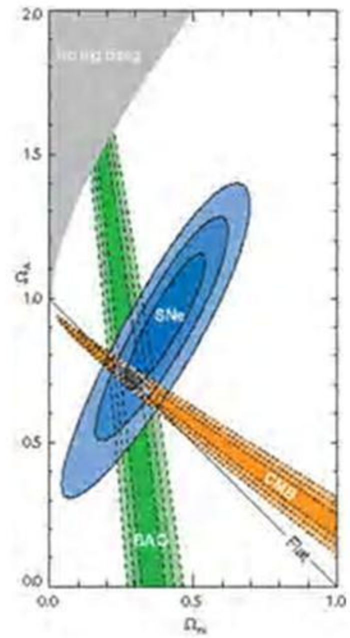

চিত্রের ঋণস্বীকার : সুপারনোভা কসমোলজি প্রজেক্ট Union 2.1 – এই চিত্রে ডার্ক এনার্জি সংক্রান্ত নানান পরীক্ষালব্ধ ফল একসাথে। X-অক্ষ বরাবর পদার্থ আর Y-অক্ষ বরাবর ডার্ক এনার্জির পরিমাপ দেওয়া হল। তিনটি প্লট যেখানে মিলেছে, সেই অংশটা দ্রষ্টব্য। ৩০ শতাংশের কাছাকাছি পদার্থ আর ৭০ শতাংশের কাছাকাছি ডার্ক এনার্জি থাকলে তবেই সব পরীক্ষার হিসেব একসাথে মেলে।

কিন্তু এরকম 'বিদঘুটে জানোয়ার কিমাকার কিম্ভূত'-কে এক কথায় মানবো কেন? আরও পরীক্ষা চাই।

হয়েছে তো। গত দেড় দশকে কয়েকশ' এরকম সুপারনোভা পরীক্ষা করা হয়েছে। প্রমাণ এসেছে আরো নানা দিক থেকে। যাদের অন্যতম সেই মহাবিশ্বের প্রথম আলো অর্থাৎ কসমিক মাইক্রোওয়েভ ব্যাকগ্রাউন্ডের পরীক্ষালব্ধ ফল। এছাড়াও আছে ব্যারিয়ন একাউস্টিক অস্সিলেসান, হাবল ডেটা এই সব আলাদা আলাদা পরীক্ষা। এরা সবাই মিলে একসাথে একই দাবী তুলেছে। আজকের বিশ্ব, এই মুহূর্তে, লাফিয়ে লাফিয়ে ফুলছে। মানে ফোলার বেগ ত্বরান্বিত হচ্ছে। এই দেখুন পাশের ছবিতে।

বলেন কী? সব্বাই একই কথা বলছে তাহলে তো মানতেই হয়। !

শুধু তাই নয়। এই সাড়া ফেলে দেওয়া আবিষ্কারের জন্য ২০১১ সালে নোবেলও পেয়ে গেলেন রিস (Riess), পার্লমুটার (Perlmutter) আর স্মিদ (Schmidt) নামে তিন বিজ্ঞানী।

তাহলে তো কথাই নেই, কি বল ভাই তপেশ?

ঠিকই তো। কিন্তু দুঃখের কথা হল ইনিও আমাদের সাথে লুকোচুরি খেলছেন প্রায় একই ভাবে। আছেন, জানাচ্ছেন নানান পরীক্ষায়। কিন্তু সোজাসুজি সামনে আসছেন না এখনো। তবে ঐ যে বললাম, মহাবিশ্বে কে কতটা অংশ দখল করে আছে, তার প্রায় সঠিক পরিমাপ পাওয়া যায় এইসব পরীক্ষানিরীক্ষায়। এককথায় বললে এই :

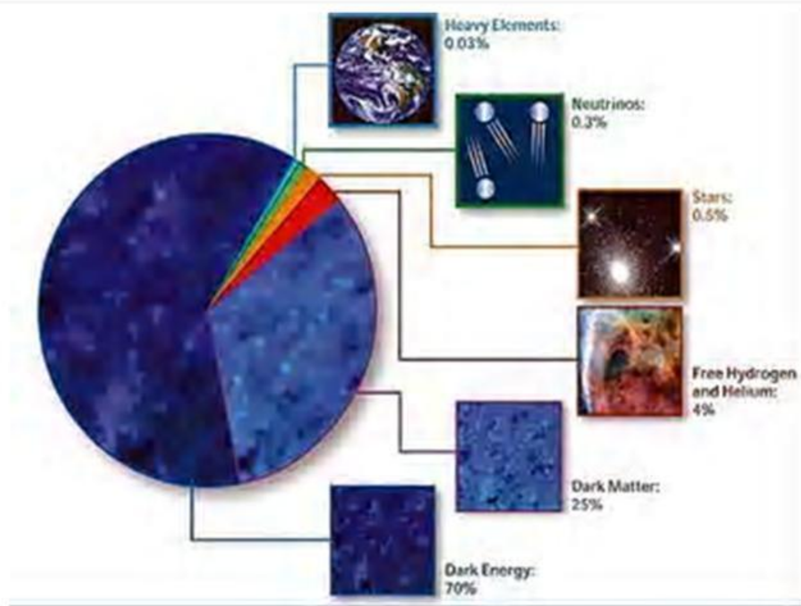

ছবির উৎস:
http://pages.towson.edu/zverev/universe/universe.htm

বাঃ। এ তো দিব্যি গড়পার স্কুলের পিঠে ভাগের অঙ্ক মশাই। কিন্তু ডার্ক ম্যাটার আর ডার্ক এনার্জি কি আলাদা বস্তু?

এক্কেবারে। ঠিক যেমন হিজিবিজবিজের বাড়ির সবার নাম তকাই হলেও তারা আলাদা আলাদা লোক। দু'জনেরই নামে 'ডার্ক' দেখে গুলিয়ে ফেললে কিন্তু আবার আমড়াতলার মোড়ে।

জানলাম। বুঝলাম। শিখলাম। অতঃ কিম?

আসল কাজটাই তো বাকি রইল মশাই। এই দুই মক্কেলকে সামনাসামনি খুঁজে বের করা। তবে তার জন্য চেষ্টা চলছে নানাভাবে। তার মধ্যে আছে টেলিস্কোপের নানা কসরৎ। চলছে দুস্তর পরিকল্পনা। আর ঘাম ঝরিয়ে পরিকল্পনার রূপায়ন। এই সব টেলিস্কোপ নিয়ে না-হয় আর একদিন হাজির হওয়া যাবে।

বেশ বেশ। আমরা নতুন করে অবাক হবার আশায় থাকলাম। তবে ভাবছি আমার উনত্রিশ নম্বর উপন্যাসটা এবার এই নিয়েই লিখতে হবে মশাই। নামটাও ঠিক করে ফেললাম এখনই।

কী নাম?

মহাকাশে হাঁসফাঁস!

আলোচনার ঋণস্বীকার : রত্না কোলে, অধ্যাপক, প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়।

প্রচ্ছদের ছবি: সূর্যকান্ত শাসমল

অতিরিক্ত তথ্য ও রেফারেন্সের জন্য দেখুন
http://bigyan.org.in/2016/03/01/dark/

(লেখাটি ১-লা মার্চ ২০১৬ তারিখে প্রকাশিত হয়েছিল)

ছদ্মবেশী

অনিন্দিতা ভদ্র

আই. আই. এস. ই. আর., কলকাতা

বসন্তকাল সমাগত। পুরুষ মৌমাছিরা উড়ে বেড়াচ্ছে এদিকে-ওদিকে। মহিলাদের এখনো পাত্তা নেই - হয়ত সাজগোজ সারা হয়নি তাদের মিলনঋতুর জন্য। এমন সময় কোনো পুরুষ মৌমাছির শুঁড়ে একটা গন্ধ এসে লাগে - এই গন্ধ তার চেনা নয়, কিন্তু তার জন্মগত কোনো এক আদিম প্রবৃত্তি তাকে বলে দেয় যে এই গন্ধের উৎস কোনো স্ত্রী মৌমাছি। গন্ধের দিকে উড়তে থাকে পুরুষ মৌমাছি, দেখতে পায় তার লক্ষ্যকে। প্রবৃত্তি-তাড়িত পুরুষটি সোজা গিয়ে বসে তার সম্ভাব্য সঙ্গিনীর ওপরে, উদ্দেশ্য - তাকে নিজের শুক্রাণু (sperm) দিয়ে বোঝাই করা। কিন্তু এখানে বাধ সাধে প্রকৃতি। পুরুষ মৌমাছির অনভিজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে তাকে ঠকিয়েছে আরেকটি প্রাণী - হয়ত শুনতে সবার অবাক লাগবে, এই প্রাণীটি আসলে একটি উদ্ভিদ।

নানা প্রজাতির অর্কিড ছড়িয়ে রয়েছে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে। এদের মধ্যে একটি প্রজাতির নাম অফ্রিস (Ophrys)। এদের দেখা যায় প্রধানত ইউরোপে। এই প্রজাতির বিশেষত্ব এদের ফুলের আকারে আর গন্ধে। যেমন ধরা যাক মিরর অর্কিডের কথা। মাটি থেকে এক ফুট মত ওপরে একটা ডাঁটির মাথায় কয়েকটা ফুল, যাদের দেখে ফুল বলে ভাবতে একটু কষ্ট হয়। একটা বেশ বড়সড় ডিম্বাকৃতি চকচকে নীলচেবেগুনি পাপড়ি-, তার ধার দিয়ে রয়েছে লাল রোঁয়াওয়ালা একটা হলুদ দাগ। দুপাশে দুটো ছোট পাপড়ি, অনেকটাই ডানার মত। ফুলগুলোকে দেখতে অবিকল ওই অঞ্চলের কিছু মৌমাছি আর বোলতার মত। কিন্তু কেন এই বিচিত্র সাজ? এর পেছনে রয়েছে প্রকৃতির এক অমোঘ নিয়ম – পৃথিবীর যে কোনো প্রাণীর সাফল্যের মাপকাঠি তার প্রজনন ক্ষমতায়। যে যত

উত্তরসূরি রেখে যেতে পারবে, তার জন্ম তত বেশি সার্থক।

পুরুষ মৌমাছির অনভিজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে তাকে ঠকিয়েছে আরেকটি জীব - একটি উদ্ভিদ।

গাছেদের যৌন অঙ্গের আধার ফুলেরা। নানা রং আর গন্ধের সাহায্যে ফুলেরা ছোটপতঙ্গ-বড় কীট-, এমনকি পাখিদেরও আকর্ষণ করে। এরা আসে ফুলের মধুর লোভে, আর ফুলেরা তাদের ব্যবহার করে অন্য ফুলেদের কাছে নিজের রেণু পৌছে দিতে। এই 'রেণুবাহক' (pollinator)-দের ছাড়া অনেক ফুলেরই প্রজনন অসম্ভব। কিন্তু এদের সবার প্রয়োজন এক নয়, তাই তাদের পছন্দও আলাদা, আর সেই সব পছন্দের সাথে নিজেদের খাপ খাইয়ে কাজ হাসিল করতে হয় ফুলেদের, তাই চারিদিকে এত রকমারি ফুলের বাহার। বেশিরভাগ ফুলই তাদের রেণুবাহকদের মধু দিয়ে, বা কখনো ডিম পাড়ার অনুকূল জায়গা দিয়ে, এমনকি রেণু দিয়েও পুরস্কৃত করে। কিন্তু বিবর্তনের খেলায় এমন কিছু ফুল তৈরী হয়েছে যারা তাদের রেণুবাহকদের বিনা পারিশ্রমিকে ব্যবহার করে। ওফ্রিস অর্কিডরা এই সুবিধেবাদী দলের এক বড়সড় অংশ।

যে মিরর অর্কিডের কথা বলেছিলাম, তারা শুধু যে তাদের রেণুবাহকদের মত দেখতে তাই নয়, এই অর্কিডরা নকল করে তাদের গন্ধও। পুরুষ মৌমাছি (বা বোলতা) দূর থেকে দেখে এই অর্কিডকে নিজের প্রজাতির স্ত্রী-মৌমাছি ভাবে, কারণ এদের গন্ধ প্রায় অবিকল তাদের সেক্স ফেরোমোন (sex pheromone) বা যৌন আকর্ষণের মত। এই বর্ণ-গন্ধের আকর্ষণে পুরুষ মৌমাছি গিয়ে বসে অর্কিডের

মিরর অর্কিড – মৌমাছির মনে হয় যে তার সঙ্গিনী ফুলের উপর ঝুলে রয়েছে ওপরের দিকে মুখ করে

ছবির উৎস:
http://www.flickriver.com/photos/camerar/tags/flowers/

ওপরে, আপ্রাণ চেষ্টা করে তার সাথে মিলিত হতে, কিছুটা চেষ্টার পর হতাশ হয়ে উড়ে যায় সঙ্গিনীর খোঁজে। কিন্তু এই ফাঁকে অর্কিড তার কাজ সেরে নিয়েছে – একগাদা রেণু মাখিয়ে দিয়েছে মৌমাছির মাথায়। কি করে? মিরর অর্কিডের রোঁয়া নিচের দিকে ঝুলে থাকে, তাতে মৌমাছির মনে হয় যে তার এই ভুয়ো সঙ্গিনী ফুলের উপর ঝুলে রয়েছে ওপরের দিকে মুখ করে। সে এসে ফুলের বড় পাপড়ির ওপরে বসে নিচের রোঁয়াগুলোর ভেতরে নিজের যৌনাঙ্গ গুঁজে দেওয়ার চেষ্টা করে। এই চাপে ফুলের ওপরের দিক থেকে শুঁড়ের মত যৌনাঙ্গ নেমে এসে মৌমাছির মাথায় একজোড়া পলিনিয়া (pollinia) বা রেণুর থলি সেঁটে দেয়। এই মৌমাছি যখন পরের মিরর অর্কিডে গিয়ে বসে, তখন এই পলিনিয়া চলে যায় সেই ফুলের স্ত্রী-অঙ্গে, আর নতুন একজোড়া পলিনিয়া আবার এসে জুটে যায় বেচারা মৌমাছির

মাথায়। বেশ কয়েকবার এইভাবে ঠকতে হয় পুরুষ-মৌমাছিদের, আর সেই সুযোগে নিজেদের কাজ হাসিল করে নেয় অর্কিডরা।

মৌমাছির কপালে কি জুটবে শুধুই অর্কিডের প্রতারণা? না, সে অত বোকা নয়।

কিন্তু মৌমাছি যদি এক অর্কিড থেকে উড়ে তার স্বজাতি অর্কিডে গিয়ে না বসে, তাহলে? তার ব্যবস্থাও করেছে প্রকৃতি। কিছু অর্কিড হলো বিশেষজ্ঞ বা স্পেশালিস্ট। কখনো দেখা যায় যে একটি প্রজাতির অর্কিড বিশেষ একটি প্রজাতির স্ত্রী-মৌমাছিকে নকল করে, তাই শুধু সেই প্রজাতির মৌমাছিরাই আকৃষ্ট হয় এই অর্কিডদের দেখে। আবার কখনো একই অঞ্চলে যেসব অর্কিড পাওয়া যায়, তাদের গর্ভকেশর (stigma) আর পুঙ্কেশর (anther) এমনভাবে সাজানো যে মৌমাছির গায়ের আলাদা আলাদা অংশকে তারা ব্যবহার করতে পারে নিজেদের কাজে। যেমন মিরর অর্কিড কাজে লাগায় মৌমাছির মাথাকে, আর সেই একই মৌমাছির শরীরের পেছনের অংশকে কাজে লাগাতে পারে অন্য কোনো অর্কিড - একজন রেণুবাহককে ভাগাভাগি করে ব্যবহার করে দুই প্রজাতি। তাহলেই আর কোনো সমস্যা রইলো না। আবার কোনো ক্ষেত্রে এক অঞ্চলের বিভিন্ন প্রজাতির অর্কিডদের ফুল ফোটার সময় হয় আলাদা, যাতে মৌমাছিরা ভুল করেও এক প্রজাতির রেণু অন্য প্রজাতির গায়ে না চাপাতে পারে। সুন্দর ব্যবস্থা নয় কি?

ফিরে আসি আমাদের প্রথম দেখা সেই মৌমাছির কাছে। সে বেচারার ভাগ্য কি এতই খারাপ যে তার কপালে জুটবে শুধুই অর্কিডের প্রতারণা? না, সে অত বোকা নয়। প্রথম প্রথম একটু আনাড়ি ছিল বলে তাকে সহজেই বোকা বানাতে পেরেছিল অর্কিডরা। কিন্তু নেড়া বেলতলায় যেমন একবারই যায়, তেমন মৌমাছিরাও বারবার ভুল করে না। আর স্ত্রী মৌমাছিরাও এবারে দেখা দিতে শুরু করে। তাদের সাথে টেক্কা দিতে পারেনা অর্কিডরা। অল্প একটু সময়ের ফাঁকে প্রকৃতি মৌমাছি আর অর্কিডদের নিয়ে একটা সুন্দর লুকোচুরির খেলা খেলে নেয়, আর সেই খেলার ঘুঁটি অর্কিডদের সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হই আমরা।

অতিরিক্ত তথ্য ও রেফারেন্সের জন্য দেখুন
http://bigyan.org.in/2015/10/05/chadmabeshi

(লেখাটি ৫-ই অক্টোবর ২০১৫ তারিখে প্রকাশিত হয়েছিল)।

প্রচ্ছদের ছবির উৎস:
http://libutron.tumblr.com/post/76463225128/a-mediterranean-orchid-that-is-pollinated

কণা পদার্থবিদ্যার জগত: বিজ্ঞানীরা যখন ডিটেকটিভ

অর্ক সাঁতরা, ফ্লোরিডা স্টেট ইউনিভার্সিটি

কখনো ভেবে দেখেছ, আমাদের আশেপাশের সব বস্তু ঠিক কি দিয়ে তৈরি?

আমরা যদি কোনো বস্তু নিয়ে ভাঙতে শুরু করি, আর লাগাতার ভাঙতেই থাকি, তাহলে কি পাবো? অবশ্যই প্রশ্নটা আজকের নয়। প্রাচীন দার্শনিকদের সময় থেকে, যেমন ভারতীয় দার্শনিক কণাদ-এর সময়ে, প্রশ্নটা নিয়ে ভাবা শুরু হয়েছে।

বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এই প্রশ্নটার প্রথম উত্তর আসে উনবিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকে। ব্রিটিশ পদার্থবিদ চার্লস ডালটন বললেন, প্রত্যেকটা পদার্থ, তা চোখে দেখতে যেমনই লাগুক, আদপে অসংখ্য পরমাণু দিয়ে গঠিত। তারপর এক সময়ে মানুষ জানতে পারল, পরমাণুর গঠন কেমন। জানতে পারল যে পরমাণুর কেন্দ্রভাগে থাকে একটা ভারি ধনাত্মক নিউক্লিয়াস, আর তাকে কেন্দ্র করে ঘুরতে থাকে ঋণাত্মক ইলেকট্রন।

কিন্তু মানুষের কৌতূহল এখানেই শেষ হল না। সে ঢুকতে চাইল নিউক্লিয়াসেরও ভেতরে। পাওয়া গেল নিউট্রন, প্রোটন। শুরু হল নিউক্লিয়ার পদার্থবিদ্যা। তবে, প্রশ্নটা সেখানেই শেষ নয়। প্রোটন, নিউট্রন – এরাই মৌলিক কণা বা ফান্ডামেন্টাল পার্টিকেল? এদের কি আর ভাঙাই যায় না?

পার্টিকেল ফিজিক্সের যাত্রা শুরু

এখানেই যাত্রা শুরু হল উচ্চ শক্তি পদার্থবিদ্যা অথবা কণা পদার্থবিদ্যার।

প্রথমেই যে প্রশ্নটা মাথায় আসে, তা হোলো উচ্চ শক্তির প্রয়োজন কেন? যদি আমাদের কাছে ভীষণ উচ্চ ক্ষমতার মাইক্রোস্কোপ থাকত, যা দিয়ে নিউক্লিয়াসের ভেতরে উঁকি মারতে পারতাম, তাহলেই তো ল্যাটা চুকে যেত। নিঃসন্দেহে সকলেই এই যন্ত্রের জন্য ঝাঁপিয়ে পড়ত। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত এরকম কোনও যন্ত্র তৈরি সম্ভব না। কারণ, মাইক্রোস্কোপটাকে কাজ করতে হলে, যা দেখতে চাই, তার সাথে আলোককণা বা ফোটনের একটা সংঘর্ষ হতে হবে, আর তারপর সেই কণাগুলোকে আমাদের চোখে আসতে হবে। কিন্তু যে সংঘর্ষের কথা এখানে ভাবছি আমরা, তাতে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই আলোককণার পঞ্চত্বপ্রাপ্তি ঘটে। আমাদের চোখে আসেনা।

তাহলে কি উপায়?

আমরা ছোটবেলায় অনেকেই কোনো না কোনো খেলনা ভেঙ্গে জানার চেষ্টা করেছি, ওর মধ্যে ঠিক কি আছে। বিজ্ঞানীরা এই পথটাই নিলেন। তাঁরা করলেন কি, বিভিন্ন কণার স্রোতকে মুখোমুখি ধাক্কা লাগিয়ে দিলেন। তারপর, সেই ধ্বংসাবশেষ থেকে জানতে চাইলেন কণাদের আচরণ, ভর ও অন্যান্য ধর্ম। এ যেন দুটো গাড়িকে মুখোমুখি সংঘর্ষ করে জানতে চাওয়া, গাড়ির ইঞ্জিনটা কোন কোম্পানির।

এই কারণেই পদার্থবিদ্যার এই বিভাগের সাথে উচ্চ শক্তি জড়িয়ে আছে। এই 'ভেঙ্গে-দেখো' পদ্ধতিতে একে একে কোয়ার্ক, গ্লুওন, W/Z বোসন, মিয়ন, টাও ইত্যাদি মৌলিক কণার সন্ধান পাওয়া গেল। জানা গেল যে প্রোটন আর নিউট্রন মৌলিক কণা নয়। ওরা কোয়ার্ক কণা দিয়ে গঠিত, আর একাধিক কোয়ার্ক কণা গ্লুওন কণা বিনিময়ের মাধ্যমে নিউক্লিয়াসের ভেতর একসাথে থাকে। কণার তালিকায় সর্বশেষ সংযোজন হিগস বোসন কণা। সেটা কিছুতেই গবেষণাগারের পরীক্ষায় ধরা দিচ্ছিল না। শেষে ২০১২-য় সুইজারল্যান্ডের CERN গবেষণাগারে ঘোষণা করা হলো যে এই কণাটাকে হয়তো দেখা গেছে।

নতুন কণার হদিশ পাওয়া সোজা নয়

প্রকৃতি বড়ই রহস্যময়ী। যেসব পদার্থবিদরা গবেষনাগারে নতুন কণা খোঁজেন, তাঁদের কাজটা মোটেই সহজ নয়। যদি গাড়ির সংঘর্ষের তুলনাটা ব্যবহার করি, সমস্যা হল এই যে সংঘর্ষের ফলে যে স্বাভাবিক গাড়ির টুকরোই দেখা যাবে, তার নিশ্চয়তা নেই। কখনো কখনো ট্রাকও বেরিয়ে আসতে পারে!

ভাবছো গাঁজাখুরি গল্প দিচ্ছি? তোমরা আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতাবাদ তত্ত্বের কথা শুনেছ নিশ্চয়ই। আমি সেই $E = mc^2$ সমীকরণটার কথা বলছি, যার দ্বারা ভর (m) আর শক্তির (E) মধ্যে রূপান্তর হয়। সমীকরণটাতে c হলো আলোর গতিবেগ, একটা খুব বড় সংখ্যা। অতএব, সমীকরণটা দেখেই বুঝতে পারছো, সামান্য ভর সৃষ্টি করতে পর্বতপ্রমাণ শক্তি লাগে।

ছোটবেলায় যেমন আমরা খেলনা ভেঙ্গে জানার চেষ্টা করেছি ওটা কি দিয়ে তৈরি, তেমনই কণার স্রোতকে মুখোমুখি ধাক্কা লাগিয়ে জানতে পারা যায় কণাদের আচরণ, ভর ও অন্যান্য ধর্ম। জানার চেষ্টা করা যায় মহাবিশ্ব কি দিয়ে তৈরি।

আগেই বললাম, নতুন কণা দেখতে হাতে মজুত কণাদের প্রচণ্ড শক্তির সাথে সংঘর্ষ ঘটানো হয়। সে শক্তি এতই বেশি যে তার থেকে কিছু শক্তি ভরে রুপান্তরিত হতে পারে এবং সেই শক্তিই অন্য কণাদের জন্মের জন্য দায়ী। তাই দুটো প্রোটন কণার সম্মিলিত ভর ২ GeV-র কাছাকাছি হলেও তাদের সংঘর্ষে আমরা ১৭৩ GeV ভরের টপ কোয়ার্ক পর্যন্ত পেতে পারি। এই অতিরিক্ত ভর আসছে প্রোটন কণাদুটোর গতিশক্তি থেকে।

সব গুলিয়ে যাছে মনে হচ্ছে কি? তাহলে কোন কণা কখন তৈরি হবে কি করে জানা যাবে? সেটাও বিজ্ঞানীরা শেষ অবধি বার করে ফেললেন। বহুদিনের চেষ্টায় (প্রায় ৫০ বছর) তত্ত্ব আর পরীক্ষার মেলবন্ধনে তৈরি হল স্ট্যান্ডার্ড মডেল। বর্তমানে আমরা যেসব কণার কথা জানতে পেরেছি, তারা এই মডেল অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলে (নিউট্রিনো নামের এক ভূতুড়ে কণা কিছুটা আলাদা)। কোন কোন কণা থেকে কি কি তৈরি হতে পারে, একইরকমের কণা থেকে বিভিন্ন কণা সৃষ্টি হলে কোনটার কতটা সম্ভাবনা, সেসব জানা যায় এই তত্ত্ব থেকে। এবং আজ অবদি যত গবেষণা হয়েছে কণা বিদ্যায়, তাতে এই স্ট্যান্ডার্ড মডেলকে ভুল মনে করার কোনো কারণ পাওয়া যায়নি।

কণা পদার্থবিদ না ডিটেকটিভ

দুটো উচ্চ শক্তির কণার স্রোতকে ধাক্কা তো মারলাম, কোন কোন কণা তৈরি হবে, সেগুলোও জানতে পারছি। কিন্তু মুস্কিল হলো, তৈরি হওয়া কণাগুলোকে আমরা ধরব কি করে? এখানে বিজ্ঞানীদের গোয়েন্দাগিরিতে নামতে হয়।

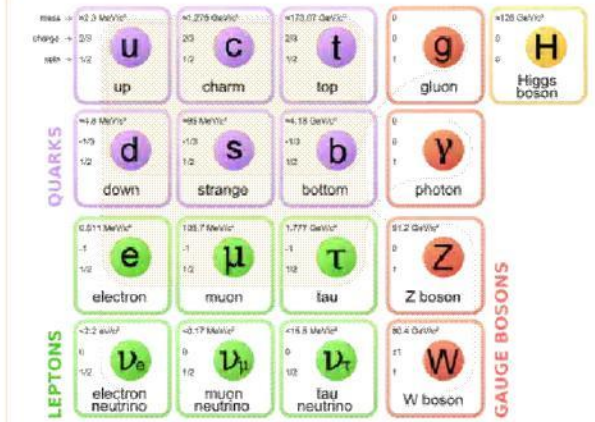

স্ট্যান্ডার্ড মডেল মেনে চলা কণাদের লিস্ট, আর বাক্সের মধ্যের অক্ষর গুলো কণাদের চিহ্ন। বেগুনীতে কোয়ার্ক, আর সবুজে লেপটন। এদের আমরা বলি ম্যাটার পার্টিকেল, কেননা এরাই (বিশেষত আপ কোয়ার্ক, ডাউন কোয়ার্ক আর ইলেকট্রন) আমাদের চারপাশের বস্তু সৃষ্টি করে। লালে গেজ বোসন, এদের আদান-প্রদানের মাধ্যমে বল (ফোর্স), অর্থাৎ আকর্ষণ বা বিকর্ষণ, তৈরী হয়। আর সবশেষে হলুদ বাক্সে হিগস বোসন, যার কাজ পদার্থকে ভর দেওয়া।

ছবির উৎস: উইকিপিডিয়া

প্রত্যেক কণাই তৈরি হবার পর প্রবল শক্তি নিয়ে ছুটে চলে। আমরা যদি কোনভাবে ওই কণাগুলোকে খাঁচায় বন্দি করতে পারি তাহলেই কেল্লাফতে! কিন্তু কণাগুলো খুবই উচ্চ শক্তির, তাই যে সে খাঁচা হলে চলবে না। আর তাই তৈরি হল বড় বড় ডিটেক্টর। এগুলোর কাজ আসলে খুবই সাধারণ, যেসব কণাগুলো এদের গায়ে ধাক্কা খাচ্ছে তাদের শক্তি কতটা সেটা হিসেব করে বলা।

একটু আগেই ডিটেকটিভের কথা বললাম, ভাবছ এই বিজ্ঞানের মাঝে আবার গোয়েন্দা কি জন্য

লাগবে? বলি তাহলে। কোন একটা সংঘর্ষ হবার পর আমরা দেখি, সেই সংঘর্ষ থেকে কি কি কণা বেরল। কিন্তু শুধু কি কি কণা বেরল সেটা জানলেই হবে না, কারণ বিভিন্ন সংঘর্ষ থেকেই একইরকম কণা বেরোতে পারে। তাই ঠিক কি ঘটেছিল, জানবার জন্য চেষ্টা করতে হয় সেই সংঘর্ষটাকে পুনর্গঠন করতে। ঠিক যেমন গোয়েন্দা কোনও অপরাধের অকুস্থল থেকে ক্লু জোগাড় করে অপরাধটা কিভাবে হল বোঝার চেষ্টা করেন। সেইরকম, এখানেও চেষ্টা করা হয় সব কণার শক্তি ঠিকঠাক পরিমাপ করতে, তারপর দেখা হয় সেগুলো ঠিক কোন কোন কণার সংঘর্ষে তৈরি হয়েছে, আর তাদের সাথে আরও কি কি কণা তৈরি হয়েছে। এগুলো ঠিকঠাক করতে পারলে তবেই 'শাবাশ তপশে!'

কণা পদার্থবিদ্যায় এখনো কি বাকি আছে

এবার নিশ্চয় ভাবছ: স্ট্যান্ডার্ড মডেল আমাদের কণার ধর্ম সম্বন্ধে বলে দিচ্ছে, আমরা ডিটেক্টরের সাহায্যে কণা গুলোকে ধরতেও পারছি, তাহলে বিজ্ঞানীরা এখনো এত এত কণার সংঘর্ষ ঘটিয়ে ঠিক কি করতে চাইছেন? মহাকাশ বিজ্ঞানীদের মতে, আমাদের চারপাশে যা কিছু আছে, এমনকি সূর্য-গ্রহ-নক্ষত্র, এরা যেসব জিনিস দিয়ে তৈরি, সেগুলো মহাবিশ্বের মোট ভর-শক্তির মাত্র ৫%! এগুলো ছাড়া আরও ২৭% হলো যাকে বলে ডার্ক ম্যাটার, আর ৬৮% ডার্ক এনার্জি। এদের নামের মধ্যে ডার্ক বা অন্ধকার আছে কারণ এরা মহাকর্ষ বল ছাড়া আর কোনভাবে এদের উপস্থিতি সম্বন্ধে জানান দেয় না। বিজ্ঞানীরা CERN এর গবেষণাগারে ডার্ক ম্যাটার সৃষ্টি করার চেষ্টা করে যাচ্ছেন। যদি সফল হন, সেটা মানব সভ্যতার মুকুটে আরও একটা পালক যোগ করবে।

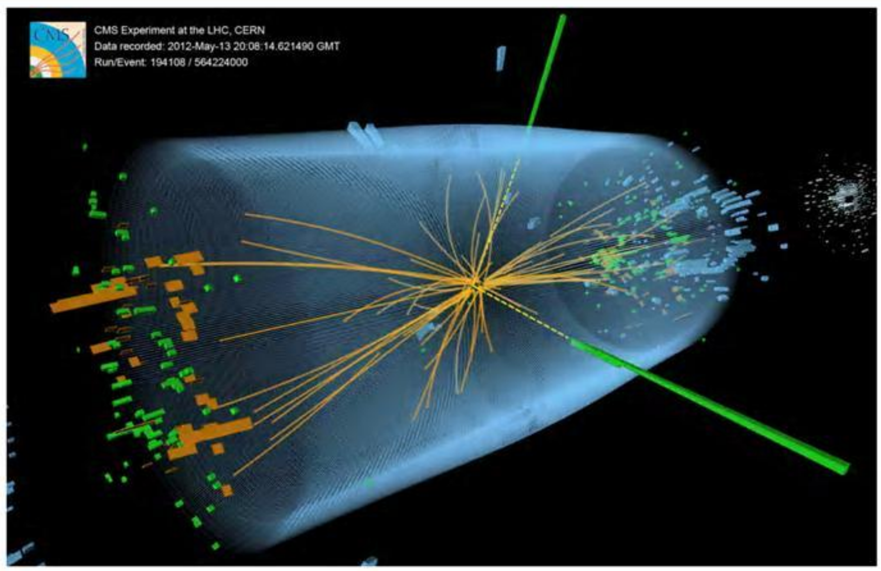

এখানে CERN এর CMS ডিটেক্টরে ধরা পড়া একটা সংঘর্ষের পুনর্গঠিত ছবি দেখান হল। এই ছবিতে একটি হিগস বোসন দুটো ফোটন কণায় ভেঙ্গে গেছে। ফোটন কণাগুলোকে দেখান হয়েছে দুটি লম্বা সবুজ সরলরেখা দিয়ে। ফোটন কণা আধানহীন, তাই চুম্বকক্ষেত্র এদের বাঁকাতে পারে না। হলুদ রঙে দেখানো হয়েছে সংঘর্ষে তৈরি হওয়া আরও নানান কণাদের। একটু লক্ষ্য করলে দেখবে, এদের বেশ কিছুরই গতিপথ বাঁকা। এদের আধান আছে, তাই চুম্বক এদের বাঁকাতে পেরেছে। ছবি দেখে বলতে পারবে, ঠিক কোথায় ধাক্কাটা লেগেছিল? । ছবির উৎস: http://www.lhcportal.com/

'দাঁড়াও, দাঁড়াও, এইমাত্র বললে যে ডার্ক ম্যাটার কিম্বা ডার্ক এনার্জি, এদের মহাকর্ষ ছাড়া আর কোনভাবে জানাই যায় না, আর CERN এর বিজ্ঞানীরা সেটা তাঁদের ডিটেক্টরে ধরে ফেলবেন?

সেটা কি করে সম্ভব? দুর্দান্ত প্রশ্ন! ঠিকই, এই ডার্ক ম্যাটার যদি CERN-এ তৈরিও হয়, এদের সরাসরি সনাক্ত করা অসম্ভব। কিন্তু ঘাবড়ে যাবার কিছু নেই, আমরা জানি শক্তি-ভরের নিত্যতা সূত্রের কথা। মানে সংঘর্ষ লাগার আগে কণাগুলোর যে শক্তি ও ভর ছিল, সংঘর্ষ ঘটার পরেও নতুন কণাগুলোর মোট ভর আর শক্তি তার সমান হওয়ার কথা। যদি আমাদের সংঘর্ষে ডার্ক ম্যাটার তৈরি হয়, তাহলে তারা ডিটেক্টর থেকে বেরিয়ে যাবে, তাদের শক্তি ধরা পড়বে না কোন মতেই। কিন্তু তখনি আমরা শক্তি-ভরের নিত্যতা সূত্র কাজে লাগিয়ে ধরে ফেলব যে ঠিক কতখানি শক্তি আমাদের হিসেবের বাইরে গেছে।

যতটা সহজে এখানে বলা হলো, কাজটা অতটা সহজ কিন্তু নয়। একটু আগেই ভূতুড়ে নিউট্রিনো কণার কথা বললাম। এদেরও ধরতে পারা ভীষণই শক্ত। প্রতি মুহূর্তেই আমাদের শরীরের মধ্য দিয়ে লক্ষ-লক্ষ নিউট্রিনো কণা ছুটে বেড়িয়ে যাচ্ছে, আমরা টেরটিও পাচ্ছি না। CERN এও এরা তৈরি হয়, আর এদের জন্য হামেশাই শক্তি-ভরের হিসেব মেলে না। তাছাড়া ডিটেক্টরও একশ শতাংশ ঠিকঠাক কাজ করে না। তারা মাঝে-সাঝে হিসেবে একটু ভুলও করে ফেলে। তাই কণা-পদার্থবিদদের একটু সাবধানী হতে হয়, বুঝে নিতে হয় কি কি ভাবে নিউট্রিনো বেরতে পারে, অথবা কি কি ভাবে ডিটেক্টর হিসাবে ভুল করতে পারে। সেইসব বুঝে শুনে বিজ্ঞানীদের সন্তর্পণে পা ফেলতে হয়।

বর্তমানে বিজ্ঞানীদের মতে স্ট্যান্ডার্ড মডেলই শেষ কথা নয়। কোথাও না কোথাও আরও নতুন কিছু অবশ্যই লুকিয়ে আছে যা আমাদের আজো অজানা। বহু বিজ্ঞানী বহু তত্ত্ব দিয়েছেন, কিন্তু সেগুলোকে পরীক্ষায় পাস করতে হবে, নইলে জানা যাবে কি করে প্রকৃতি কি নিয়মে নিজেকে চালিত করে। CERN এর বিজ্ঞানীরা এখন ঠিক এই কাজেই মত্ত।

অতিরিক্ত তথ্য ও রেফারেন্সের জন্য দেখুন http://bigyan.org.in/2015/12/28/introduction-to-particle-physics/

(লেখাটি ২৮-শে ডিসেম্বর ২০১৫ তারিখে প্রকাশিত হয়েছিল)।

প্রচ্ছদের ছবির উৎস:
http://www.dailygalaxy.com/my_weblog/2015/09/beyond-the-higgs-natures-top-quark-hints-the-universe-could-suddenly-collapse.html

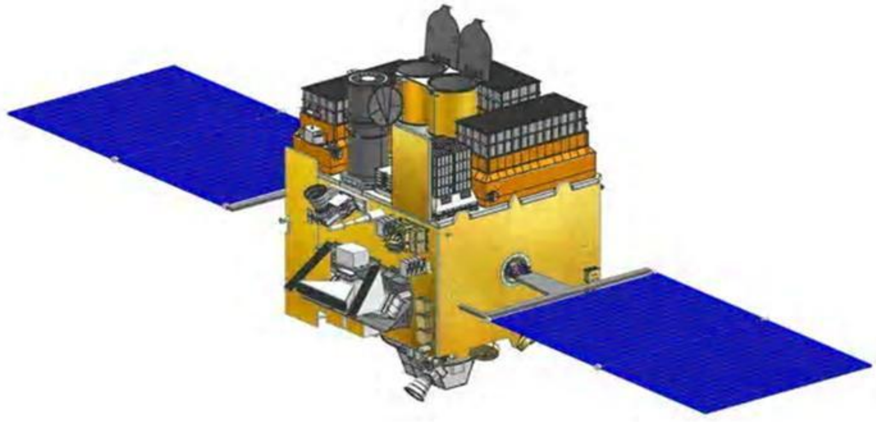

অ্যাস্ট্রোস্যাট : জ্যোতির্বিদ্যার জগতে ভারতের অনন্য অবদান

মৈয়াঙ্ক ভাহিয়া, টাটা ইনস্টিটিউট অফ ফান্ডামেন্টাল রিসার্চ

মহাকাশে ভারত পাঠালো তার নিজের তৈরী প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ, অ্যাস্ট্রোস্যাট (ASTROSAT)। তারিখ – সেপ্টেম্বর ২৮, ২০১৫।

উপগ্রহটি প্রায় পুরোটাই ভারতে পরিকল্পিত ও নির্মিত। সামান্য কিছু জরুরী বিদেশী সাহায্য নেওয়া হয়েছে। প্রযুক্তির দিক থেকে উপগ্রহটি অত্যন্ত উন্নত মানের এবং আশা করা হচ্ছে, এটি ভারতীয় জ্যোতির্বিদ্যা গবেষণাকে অনেকদূর এগিয়ে নিয়ে যাবে।

অ্যাস্ট্রোস্যাট উপগ্রহটি অধ্যাপক পি. সি. আগরওয়ালের মস্তিষ্কপ্রসূত। তৎকালীন 'ইসরো'-র (ইন্ডিয়ান স্পেস রিসার্চ অরগানাইজেশন, ISRO) চেয়ারম্যান ড: কস্তুরীরঙ্গন ওনাকে প্রচুর উৎসাহ দিয়েছিলেন এ ব্যাপারে। সে প্রায় ১৫ বছর আগের কথা। সদ্য একটা ছোট এক্স-রে টেলিস্কোপ বানিয়েছেন অধ্যাপক আগরওয়াল, অন্য একটি কৃত্রিম উপগ্রহের জন্য। এইসময় তাঁর মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল: উন্নত দেশগুলোর সাথে প্রতিযোগিতায় না নেমে, তারা যেদিকে বিশেষ নজর দিচ্ছে না, সেইদিকটা দেখা যাক না, কি হয়!

> 'অ্যাস্ট্রোস্যাট'-এর হাত ধরে ভারত প্রবেশ করল উচ্চ প্রযুক্তির জ্যোতির্বিজ্ঞানের জগতে।

জ্যোতির্বিদ্যা গবেষণার নানান সমস্যা

জ্যোতির্বিদ্যা গবেষণাতে কিছু বিশেষ সমস্যা আছে, যে ধরণের সমস্যা নিয়ে আর কোনো বিষয়ের গবেষণায় মাথা ঘামাতে হয়না। এরমধ্যে প্রথম সমস্যা হলো পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের আচ্ছাদন, যা শুধুমাত্র বিশেষ কিছু তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলোকেই ভিতরে প্রবেশ করতে দেয়। তাই, শুধুমাত্র পৃথিবীতে বসে থেকে গবেষণা সম্পূর্ণ করা মুশকিল। অন্য সব বিষয়ের মত যেমন খুশি এক্সপেরিমেন্ট ডিজাইন করা যায় না, বিভিন্ন সূত্র থেকে সংগৃহীত তথ্য একত্র করতে হয়।

লেখাটি DNA সংবাদ-পত্রে প্রকাশিত হয়েছিল। ইংরাজী থেকে বাংলায় অনুবাদ করেছে অনির্বাণ গঙ্গোপাধ্যায়।
'বিজ্ঞান'-এ প্রকাশ করার অনুমতি দেওয়ার জন্য DNA এবং প্রফেসর ভাহিয়া-র কাছে আমরা কৃতজ্ঞ।

শুধু তাই নয়, একটা আলোর সূত্রকে চারিদিকে প্রদক্ষিণ করে সমস্ত দৃষ্টিকোণ থেকে যে দেখা হবে, অনেক সময় সেটাও সম্ভবপর হয়ে ওঠেনা। আবার, মহাকাশের বাসিন্দারা আয়তনে হয় বিপুল, হাজারের পর হাজার মাইল ধরে তাদের ব্যাপ্তি। তার উপর, অবিকল একই মহাজাগতিক বস্তু একটার বেশি পাওয়া মুশকিল। তাই দুটো বস্তু মোটামুটি একরকম পেলে তাতেই সন্তুষ্ট থাকতে হয়। অন্য সব গবেষণাতে, একই বস্তুর অনেকগুলো অবিকল প্রতিরূপ বা 'কপি'-র উপর একটা পরীক্ষা করে পরীক্ষার ফলের উপর ভরসা করা যায়। কিন্তু জ্যোতির্বিদ্যা গবেষণায় অবিকল একই জিনিষ পাওয়া দুরূহ ব্যাপার।

শেষ সমস্যাটা হলো, বিপুল আয়তনের এই মহাজাগতিক বস্তুগুলি নিজেরাই সর্বত্র সমসত্ত্ব হয়না। আমাদের সৌরমণ্ডলের বাইরে যেকোনো বস্তুকে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, তাদের কিছু জায়গার তাপমাত্রা কোটির ঘরে চলে গেছে, আবার কিছু জায়গার তাপমাত্রা কয়েক কেলভিন মাত্র (-২৭০ ডিগ্রী সেলসিয়াসের নিচে)। কিছু জায়গা এতই ঘন যে সে ঘনত্ব মাপার উপায় আমাদের কাছে নেই। আবার কিছু জায়গা এতই পাতলা যে একটা মিটার সাইজের পাত্র নিয়ে সেই অঞ্চলের মধ্যে দিয়ে কয়েক লক্ষ বছর ধরে চললে সেই পাত্রে এক গ্রামেরও কম হাইড্রোজেন জমা পড়বে।

মহাজাগতিক বস্তুগুলি থেকে বিভিন্ন তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলো নিঃসৃত হয়, রেডিও তরঙ্গ থেকে শুরু করে গামা তরঙ্গ অব্দি।

এই তাপমাত্রা আর ঘনত্বের বিস্তৃতির ফলে মহাজাগতিক বস্তুগুলি থেকে বিভিন্ন তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলো নিঃসৃত হয়, রেডিও তরঙ্গ থেকে শুরু করে এক্কেবারে গামা তরঙ্গ অব্দি। রেডিও তরঙ্গ দৈর্ঘ্যে অনেক বড়, তাই তাকে ধরতে অনেক বড় ব্যাসের অ্যানটেনার প্রয়োজন হয়। অপরদিকে গামা তরঙ্গ এতই ছোট যে তাদের দৈর্ঘ্য একটা পরমাণুর নিউক্লিয়াসের ব্যাসার্ধের থেকেও কম। এই তরঙ্গরশ্মিগুলো ধরতে বিশেষ কিছু পদার্থের ক্রিস্টাল বা স্ফটিক ব্যবহার করা হয়।

নাসার হাবল টেলিস্কোপ-, যা দিয়ে দৃশ্যমান এবং আলট্রাভায়োলেট রশ্মি সনাক্ত করা যায়-

ছবির উৎস: উইকিপিডিয়া

নাসার দাপট

বিগত অর্ধশতাব্দীতে, আমেরিকা, রাশিয়া-সহ বহু দেশ মহাকাশে টেলিস্কোপ বসিয়েছে। এর মধ্যে আমেরিকার নাসা-র (NASA) অবদান সবথেকে বেশি। নাসার টেলিস্কোপগুলি খুবই হাই-রিসোলিউশন, অর্থাৎ সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর খুঁটিনাটির তফাৎ করতে পারে। দৃশ্যমান আলো, গামা, অবলোহিত (ইনফ্রারেড) কিম্বা এক্স-রে রশ্মি, সব তরঙ্গদৈর্ঘ্যের জন্যেই তাদের আলাদা আলাদা টেলিস্কোপ আছে। টেলিস্কোপগুলো খুবই ক্ষমতাশালী এবং খুব সামান্য আলো থেকেই কষে ফেলতে পারে আলোককণার শক্তি।

মহাবিশ্বের নানান কোণে উৎপত্তি হয় এক্সরে রশ্মি-, যা নাসা র-'চন্দ্র' টেলিস্কোপ দিয়ে ধরা যায়। ছবির উৎস: উইকিমিডিয়া

নাসা এ ব্যাপারে অনেকদূর এগিয়ে গেছে। কয়েক টন ওজনের যন্ত্র মহাকাশে পাঠানো, কি দূর থেকে সেগুলোকে সূক্ষ্মভাবে নিয়ন্ত্রণ করা, এসবে তাদের পারদর্শিতার ধারেকাছেও আসা মুশকিল। আজকের দিনে অন্য কোনো দেশ কোনো তরঙ্গদৈর্ঘ্যেই নাসাকে হয়তো টেক্কা দিতে পারবে না।

এরকম একটা কঠিন পরিস্থিতিতে ভারতের মহাকাশবিজ্ঞানীরা মাঠে নামলেন। ভারতীয় বিজ্ঞানীরা স্বপ্ন দেখতে শুরু করলেন, একদিন জ্যোতির্বিদ্যা গবেষণায় ভারত স্বয়ংসম্পূর্ণ হবে। 'মঙ্গলযান' কিম্বা 'চন্দ্রযান' এর মতো স্বাভাবিক পদক্ষেপ ছিল সেই দিশায়। কিন্তু এর মানে এটা কোনভাবেই নয় যে কাজগুলো সহজ ছিলো, 'ইসরো' খুবই দক্ষতার সাথে এগুলো সম্পন্ন করেছে। তবে, 'অ্যাস্ট্রোস্যাট' এর গুরুত্ব অপরিসীম, এটা পাঠিয়ে ভারত সারা বিশ্বের জ্যোতির্বিদ্যা গবেষণায় একেবারে একটা নতুন অধ্যায় খুলে ফেলেছে।

স্পেস মিশন যখন অন্ধ লোকের হাতি বর্ণনার সামিল

আমরা আগেই জেনেছি মহাজাগতিক বস্তুগুলি খুবই জটিল এবং সবরকম তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলো নির্গত হয় তাদের থেকে। এযাবৎ সমস্ত স্পেস মিশনই কোনো একটা বিশেষ তরঙ্গদৈর্ঘ্যের শ্রেণীর মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ রেখেছে এবং মহাকাশের সর্বত্র তাকিয়ে দেখেছে সেই বিশেষ তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলোর জন্য।

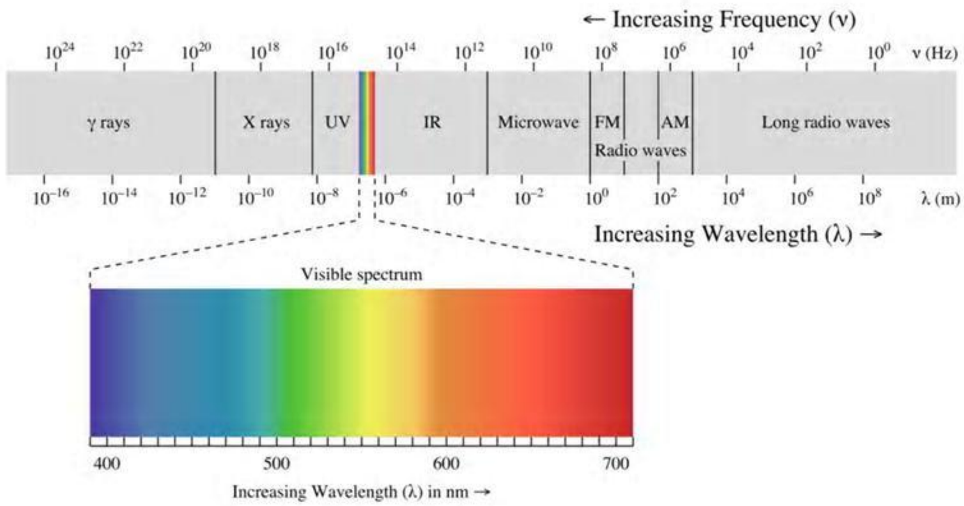

আলোর নানান তরঙ্গদৈর্ঘ্য। ভারতের অ্যাস্ট্রোস্যাট দৃশ্যমান আলো থেকে আলট্রাভায়োলেট এবং এক্সরে রশ্মি-, সব তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলোকেই একসাথে ধরতে পারবে।

ছবির উৎস: উইকিমিডিয়া

কিন্তু, জ্যোতির্বিদ্যার সমস্যা এটাই যে একটা বিশেষ তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলোর মধ্যে সীমিত থাকলে একটা বস্তুকে সম্পূর্ণরূপে বোঝা যায়না। ব্যাপারটাকে চারটে অন্ধ লোকের হাতি বর্ণনার কাহিনীর মতো বর্ণনা করা যেতে পারে। সেখানে প্রত্যেকজন হাতির যেখানটা স্পর্শ করেছে তার বর্ণনা দিয়েছে, কিন্তু তাই দিয়ে কি একটা হাতির ছবি পাওয়া যায়? সেরকমই কোনো বস্তুর একটা সম্পূর্ণ ছবি পেতে তার থেকে নিঃসৃত সমস্ত তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলোকেই ধরতে হবে।

এর একটা সমতুল্য ব্যাপার আমাদের দৈনন্দিন জীবনেও দেখা যায়। ধরুন, এয়ারপোর্ট সিকিউরিটির কথা। প্রথমে সিকিউরিটির লোকজন আমাদের দিকে চেয়ে দেখবে। তারপর এক্সরের - সাহায্যে দেখবে সঙ্গে কোনো বিপজ্জনক বস্তু লুকিয়ে রেখেছি কিনা। কয়েক জায়গাতে, থার্মাল বা ইনফ্রারেড তরঙ্গেও ছবি তোলা হয়, লুকোনো জিনিস খুঁজতে। এই তিন ধরণের তরঙ্গ - অপটিক্যাল, এক্স রে এবং ইনফ্রারেড- এই তিনে মিলে তবে বোঝা যায় আপনি কেমন যাত্রী হবেন। জ্যোতির্বিদ্যাতেও একই দশা।

> ভারত তৈরী করল এমন একটা বহু-তরঙ্গ শনাক্তকারী কৃত্রিম উপগ্রহ যা দৃশ্যমান আলো থেকে আলট্রাভায়োলেট এবং এক্স-রে রশ্মি, সব তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলোকেই একসাথে ধরতে পারবে।

ভারতের কিস্তিমাত

এখানেই অধ্যাপক আগরওয়াল এবং অ্যাস্ট্রোস্যাট দলের অন্যান্য সদস্যদের দূরদর্শিতার পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁরা চিন্তা করলেন আরেকটা ছোট হাবল টেলিস্কোপ পাঠিয়ে নতুন কিছু তো করা হচ্ছে না, নাসা সেদিকে অনেকদূর এগিয়ে গেছে, তার চেয়ে অনেক কাজের হবে যদি অনেকগুলো তরঙ্গদৈর্ঘ্য একসাথে ধরা যায়। তাতে হয়তো একটা বস্তু বা মহাকাশের একটা কোণের মধ্যে সীমিত থাকতে হবে, কিন্তু সেই বস্তুর অনেক সম্পূর্ণ একটা ছবি পাওয়া যাবে। একটা বিশেষ শ্রেণীর তরঙ্গের জন্য গোটা মহাকাশ চষে বেড়ানোর দরকার নেই। তার জন্য অনেক ক্ষমতাশালী টেলিস্কোপ মহাকাশের দিকে চেয়ে রয়েছে।

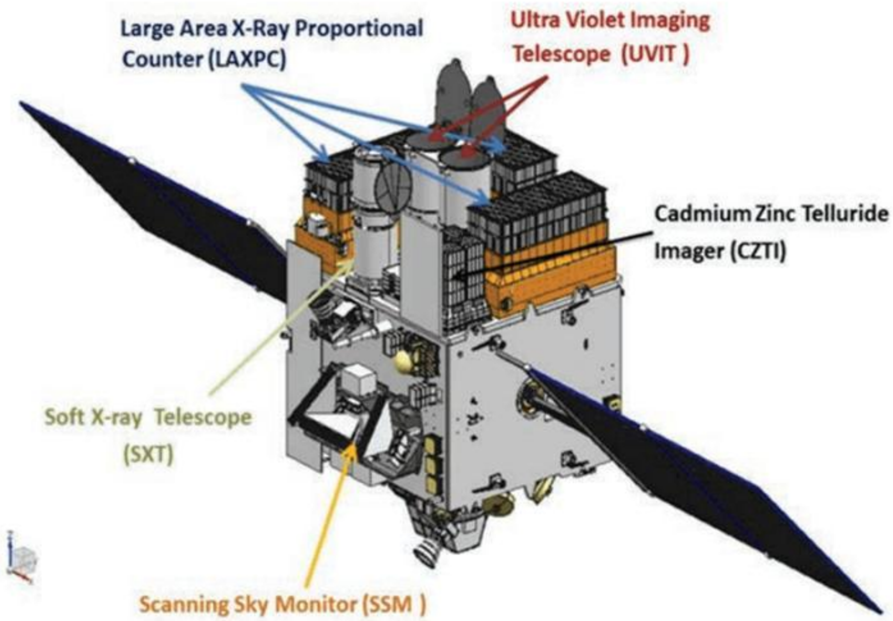

অ্যাস্ট্রোস্যাট-এর বিভিন্ন ডিটেক্টর। (ছবি-ইসরো)

তৈরী হলো এমন একটা বহু-তরঙ্গ শনাক্তকারী (মাল্টি-ওয়েভলেংথ) কৃত্রিম উপগ্রহ যা দৃশ্যমান আলো থেকে আলট্রাভায়োলেট এবং এক্স-রে রশ্মি, সব তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলোকেই একসাথে ধরতে পারবে। এর জন্য আলোর সূত্রটাকে একটু বেশি উজ্জ্বল হতে হবে, কিন্তু তা যদি হয়, তাহলে আমাদের অ্যাস্ট্রোস্যাট তার একটা সম্পূর্ণ ছবি দিয়ে দিতে পারবে। সেই আলোকতরঙ্গের খবর থেকে পৃথিবীতে বসা বিজ্ঞানীরা আলোর সূত্রটার নানা খুঁটিনাটি বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

আইডিয়াটা সহজ অথচ এত সুন্দর যে বিশ্বজুড়ে সবাই নড়েচড়ে বসেছে। বিশেষ করে এমন একটা সময়ে এটা এসেছে, যখন নাসা ভবিষ্যৎ মিশনের ব্যাপারে সংযম আনার চেষ্টা করছে। তিন দশক ধরে যন্ত্রপাতি নিয়ে গবেষণার পেছনে অর্থব্যয় করে নাসার বাজেটে একটু টান পড়েছে এবং যথেচ্ছ মিশন প্ল্যান করার স্বাধীনতা কমে গেছে। এইরকম সময়ে, আশা করা যায় অ্যাস্ট্রোস্যাটের এই সহজ পদ্ধতিটা অনেকেরই মনে ধরবে। তরঙ্গদৈর্ঘ্যের উপর মনঃসংযোগ না করে মহাকাশে অবস্থিত বস্তুর উপর মনঃসংযোগ করা — এই নতুন ধরণের চিন্তা হয়তো পাল্টে দেবে, ভবিষ্যতে কিভাবে স্পেস মিশনের পরিকল্পনা নেওয়া হবে।

এই অভাবনীয় প্রজেক্ট নেওয়ার জন্য অধ্যাপক আগরওয়াল এবং অন্যান্য বিজ্ঞানীদের একটা কুর্ণিশ অবশ্যই প্রাপ্য। যেসব বিজ্ঞানীরা

অ্যাস্ট্রোস্যাটের জন্য যন্ত্রপাতি বানিয়েছেন, তারা নিম্নোক্ত গবেষণাগারগুলির সাথে যুক্ত: টাটা ইনস্টিটিউট অফ ফান্ডামেন্টাল রিসার্চ (মুম্বাই), ইন্টার ইউনিভার্সিটি সেন্টার ফর অ্যাস্ট্রোনমি এন্ড অ্যাস্ট্রোফিজিক্স (পুনে) এবং রামন রিসার্চ ইনস্টিটিউট (বেঙ্গালুরু)। এছাড়া দুটো যন্ত্রের ডিটেক্টর এসেছিল কানাডিয়ান স্পেস এজেন্সী এবং ইউনিভার্সিটি অফ লেস্টার (Leicester) থেকে।

উপগ্রহের উপর যন্ত্রপাতিগুলো এবার আস্তে আস্তে চালু করা হবে। এর ফলে আশা করা যায়, আমরা চারিপাশের মহাকাশকে একটা নতুন চোখে দেখতে পাব।

অতিরিক্ত তথ্য ও রেফারেন্সের জন্য দেখুন http://bigyan.org.in/2016/02/01/astrosat/

(লেখাটি ১-লা ফেব্রুয়ারি ২০১৬ তারিখে প্রকাশিত হয়েছিল)।

প্রচ্ছদের ছবি :ISRO

TIFR-এর ডিরেক্টরের অফিসে রয়েছে 'অ্যাস্ট্রোস্যাট'-এর এই রেপ্লিকাটি। 'ইসরো'-র উপহার।

ম্যালেরিয়া : নোবেল পুরস্কার এবং মানুষের ভবিষ্যৎ

সুমন্ত দে, ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি

২০১৫ সালে চিকিৎসা বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার দিয়ে যাদের সম্মানিত করা হল, তারা সকলেই পরজীবী বা প্যারাসাইট (parasite) জনিত রোগের মোকাবিলায় নজির স্থাপন করেছেন। এদের দ্বারা প্রবর্তিত চিকিৎসা পদ্ধতি যে কত মানুষের প্রাণ বাঁচিয়েছে, তার হিসেব মেলা ভার! আজকের লেখার বিষয় তাদেরই একজনকে নিয়ে: চীনের মহিলা বিজ্ঞানী, ইয়উয়উ টু। চীনের প্রাচীন চিকিৎসা পদ্ধতির ব্যবহারিক জ্ঞান কাজে লাগিয়ে, ষাট-সত্তরের দশকে, ম্যালেরিয়া রোগের চিকিৎসায় তিনি এক বিপ্লব ঘটিয়েছিলেন।

প্রথমেই প্রশ্ন আসে: ম্যালেরিয়ার চিকিৎসা তো সাড়ে তিনশো বছর ধরে চলে আসছে, প্রোফেসর টু নতুন কি করলেন? এমন তো নয় যে ষাট-সত্তরের দশকের আগে ম্যালেরিয়া হওয়া মানেই নির্ঘাত মৃত্যু ছিল! সেই গল্প জানতে হলে, আগে ম্যালেরিয়া রোগ আর তা নিরাময়ের জন্যে ব্যবহৃত

ম্যালেরিয়া রোগের নতুন চিকিৎসা পদ্ধতি আবিষ্কার করার জন্য ২০১৫ সালে নোবেল পুরষ্কার পেলেন চীনা বিজ্ঞানী, ইয়উয়উ টু।

১৯৫০-এর দশকে তোলা ছবি - ইয়উয়উ টু (ডান দিকে) এবং লাও জিচেন গবেষণায় ব্যস্ত।

ছবির উৎস:
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/asia/china/11912754/Nobel-Prize-for-Chinese-traditional-medicine-expert-who-developed-malaria-cure.html

নানা রকমের ওষুধের জৈব-রাসায়নিক ক্রিয়া পদ্ধতির কথা জানা দরকার।

ম্যালেরিয়ার আদি শত্রু: কুইনিন

কিছু বিশেষ মশার কামড়ে ম্যালেরিয়া হয়, তা আমরা সকলেই জানি। রোগের উপসর্গ সর্বাঙ্গে কাঁপুনি দিয়ে জ্বর, আর অনেক ক্ষেত্রেই পরিনতি মারাত্মক! বহুকাল আগে থেকেই পেরু এবং বলিভিয়ার মত দেশে, কাঁপুনি দিয়ে জ্বর এলেই সিনকোনা গাছের ছালের রস খাইয়ে মানুষের প্রাণ বাঁচানো হত। লক্ষণীয় বিষয়, ঠিক একই সময়ে চীনদেশেও সেই জ্বরের চিকিৎসা করা হত সুইট ওয়ার্মউড গাছের পাতার রস দিয়ে।

১৮২০ সালে ফরাসি বিজ্ঞানীরা দেখান যে সিনকোনা গাছের ছালে কুইনিন নামে একটা পদার্থ ম্যালেরিয়া রোগ সারায়।

গাছের নির্যাস খাইয়ে চিকিৎসা করা গেলেও সেই গাছ পৃথিবীর সব দেশে পাওয়া যেত না। গাছের ছালের আমদানি করেও চাহিদা মেটানো সহজ ছিল না। ১৮২০ সালে ফরাসি বিজ্ঞানীরা বের করেন যে সিনকোনা গাছের ছালের রসে কুইনিন নামে একটা জৈব-রাসায়নিক পদার্থ আছে। গাছের ছালের মধ্যে থাকা এই কুইনিনই আসলে ম্যালেরিয়া রোগ সারায়। এই তথ্যটা জানার পরেই কুইনিনের মত রাসায়নিক পদার্থ বানানো শুরু হয়ে গেল বিভিন্ন গবেষণাগারে। তার ফলে আবিষ্কার হল অনেকগুলো ওষুধ, যাদের মধ্যে সব থেকে বেশি সাফল্য পেল ক্লোরোকুইন। ১৯৩৪ সালে ক্লোরোকুইনের আবিষ্কারের পর থেকে সমস্ত দেশে এর ব্যাপক ব্যবহার শুরু হল।

সিনকোনা গাছের ছাল, যা থেকে তৈরি করা হয় কুইনিন।

ছবির উৎস: উইকিপিডিয়া

কিন্তু, ১৯৫০ সালের পর থেকেই দেখা গেল যে এই ওষুধ বেশ কিছু ক্ষেত্রে কাজ করছে না। কারণ: অতিরিক্ত মাত্রায় ক্লোরোকুইনের ব্যবহার। দুই-তিন দশকের মধ্যেই, পৃথিবীর সমস্ত ম্যালেরিয়া-প্রবণ দেশে দেখা গেল ক্লোরোকুইন তার কার্যক্ষমতা হারিয়েছে। ফলে ম্যালেরিয়া-জনিত রোগে মৃত্যুর হার বেড়ে গেল দুই-তিন গুণ।

ম্যালেরিয়া সারাতে যুদ্ধকালীন তৎপরতা

এরই মাঝে ১৯৫৫ সালে শুরু হয়ে গেল ভিয়েতনাম যুদ্ধ। উত্তর ভিয়েতনাম লড়ছিল দক্ষিণ ভিয়েতনাম এবং আমেরিকার বিরুদ্ধে। মানুষের পরিকল্পিত

যুদ্ধের মাঝে, সামরিক বাহিনীর মধ্যে ভীষণ আতঙ্ক হয়ে দাড়ালো ম্যালেরিয়া। দরকার হয়ে পড়ল দ্রুত রোগ নিরাময়ের। নিরূপায় উত্তর ভিয়েতনামের দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিল চীন। ২৩ মে, ১৯৬৩ সালে চীন শুরু করলো এক গোপন প্রকল্প - "প্রজেক্ট ৫২৩"।

সেই "প্রজেক্ট ৫২৩"-তেই যোগ দেন ইয়উয়উ টু এবং আরও অনেক বিজ্ঞানী। ১৯৭০ সালে সুইট ওয়ার্মউড গাছড়ার নির্যাসে পাওয়া গেল আরটেমিসিনিন (Artemisinin) নামের একটি পদার্থ। চীনা ভাষায় এর নাম চিংহাউসু (qinghaosu)। আরটেমিসিনিন ম্যালেরিয়ার বিরুদ্ধে কাজ করতে সক্ষম। কিন্তু পদার্থটা ব্যবাহারযোগ্য অবস্থায় এই গাছড়া থেকে উদ্ধার করাটা মোটেই সহজ কাজ ছিল না।

সমস্যা ছিল তখনকার প্রচলিত রাসায়নিক নিষ্কাশন পদ্ধতি। যে তাপমাত্রায় রাসায়নিক পৃথকীকরণ করা হচ্ছিল, সেই তাপমাত্রায় আরটেমিসিনিনের কার্যক্ষমতা যাচ্ছিল অনেক কমে। ইয়উয়উ টু এবং তাঁর সহকর্মীরা জয়লাভ করলেন সেখানেই। তাঁরা এক নতুন পদ্ধতির উদ্ভাবন করলেন, যার দ্বারা রাসায়নিক ভাবে আরটেমিসিনিনের নানান সক্রিয় যৌগ নিষ্কাশন করা সম্ভব হলো।

ব্যবহার করো কিন্তু সামলে

নব্বইয়ের দশকের প্রথম দিকে, ক্লোরোকুইন কাজ না করলে প্রয়োগ করা হত আরটেমিসিনিন যৌগগুলোর একটা পাঁচ-মেশালী বা আরটেমিসিনিন বেসড কম্বিনেশন থেরাপি (ACT)। ACT-র মধ্যে থাকতো:

(১) যে কোনও একটা আরটেমিসিনিনের যৌগ, এবং

(২) অন্য কোনও ক্লাসের অ্যান্টি-ম্যালেরিয়াল ওষুধ যেমন লুমেফ্যানট্রিন, মেফ্লোকুইন, অ্যামোডায়াকুইন, ইত্যাদি।

ACT-এর মধ্যে আরটেমিসিনিন যৌগের কাজ হচ্ছে প্রথম তিন দিনের মধ্যেই রক্তের মধ্যে থাকা বেশীর ভাগ পরজীবীর সংখ্যা কমানো। অপর ওষুধটি বাকি বেঁচে থাকা পরজীবীদের মেরে ফেলে।

এই থেরাপির সুবিধে এটাই যে এতে আরটেমিসিনিন যৌগ প্রয়োগের মাত্রাটা কম রাখা সম্ভব। চিকিৎসা পদ্ধতিতে এর বেশ একটা লাভজনক দিকও রয়েছে। ওষুধের পার্শ্ব পতিক্রিয়া তো কম থাকেই। তাছাড়া আরটেমিসিনিন কম পরিমাণে ব্যবহার করলে তার কার্যক্ষমতা অনেক বেশি দিন থাকে। কারণ আর কিছুই না, আরটেমিসিনিন-প্রতিরোধী পরজীবীদের ছড়াতে অনেক বেশি সময় লাগে। অন্তত এমনটাই বিজ্ঞানীদের অনুমান।

বর্তমানে ৭৯টি দেশে ACT-কে প্রথম সারির চিকিৎসাপদ্ধতি হিসেবে ব্যাবহার করা হয়। ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গ্যানাইজেশন (WHO)-এর রিপোর্ট অনুযায়ী ACT-র ব্যবহারের ফলে ম্যালেরিয়ায় মৃত্যুর হার তিরিশ শতাংশ কমেছে। তাহলে বুঝতেই পারছ যে ম্যালেরিয়ার চিকিৎসায় আরটেমিসিনিন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার।

সুইট ওয়ার্মউড গাছড়ার নির্যাসে ইয়উয়উ টু এবং তাঁর সহকর্মীরা পেলেন 'আরটেমিসিনিন', যা ক্লোরোকুইন প্রতিরোধী ম্যালেরিয়ার বিরুদ্ধে কাজ করতে সক্ষম।

ম্যালেরিয়া জীবাণুর জীবনচক্র

কুইনিন কোথায় ব্যর্থ হলো আর আরটেমিসিনিন কেন সফল, সেটা বুঝতে হলে ম্যালেরিয়ার সংক্রমণ পদ্ধতি সম্বন্ধে একটু গভীরে ঢুকতে হবে।

মানুষের মধ্যে ম্যালেরিয়ার জন্য দায়ী প্লাসমোডিয়া গোত্র বা 'জেনাস'-এর পরজীবী। প্লাসমোডিয়াম ফ্যালসিপেরাম আর প্লাসমোডিয়াম ভাইভ্যাক্স – এই দুটো পরজীবী ম্যালেরিয়া-জনিত মৃত্যুর প্রধান কারণ। পরজীবীর প্রবেশ থেকে শুরু করে তার প্রজনন, পুরো চক্রটা খানিকটা এইরকম হয়।

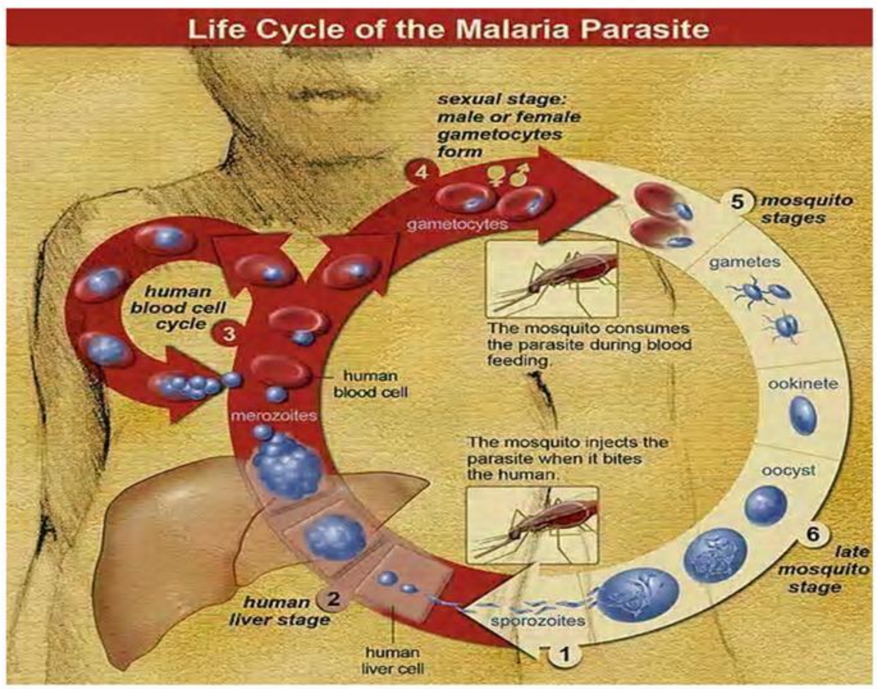

ম্যালেরিয়া জীবাণুর জীবনচক্র। ছবির উৎস: উইকিপিডিয়া

১। লিভার দশা (liver stage): স্ত্রী অ্যানোফিলিস মশা পরজীবীকে শরীরের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দেয়। মুহূর্তের মধ্যেই সে যকৃত বা লিভার-এর কোষের ভিতরে গা ঢাকা দেয়। এই দশায় থাকাকালীন পরজীবীরা আমাদের কোনও জানান দেয় না।

২। রক্ত দশা (blood stage): এরপর পাঁচ-ছ' দিনের মধ্যেই পরজীবীরা যকৃত থেকে লোহিত রক্ত কণিকায় নিজেদের জায়গা বানিয়ে ফেলে। এই দশাতেই শারীরিক জটিলতা শুরু হয়। কাঁপুনি দিয়ে জ্বর আসাটা এই সময়েই হয়ে থাকে। পরজীবীরা রক্ত কণিকার ভিতরে থাকা হিমোগ্লোবিন ভেঙে গ্লোবিন প্রোটিনকে নিজেদের বিপাকীয় প্রক্রিয়ায় ব্যবহার করতে শুরু করে। এইভাবে তাদের জীবনচক্র এগোতে থাকে। আর এই কারণেই এরা পরজীবী: শত হলেও, মানব দেহে হিমোগ্লোবিন তো আর এদের পুষ্টির জন্য তৈরী হয়নি!

হিমোগ্লোবিন ভাঙার এই ঘটনা ঘটে পরজীবীর ভিতরে থাকা খাদ্য থলির মধ্যে। হিমোগ্লোবিন ভাঙার পরে গ্লোবিন ব্যবহার হলেও, খাদ্য থলির ভিতরে অবশিষ্ট থাকে হিম (Heme)। এই হিম অণু পরজীবীদের কাছে খুব ক্ষতিকারক। পরজীবীরা তাই চটপট এই হিমকে হিমোজইন নামক পদার্থে পরিবর্তন করে ক্ষতিকারক হিমের হাত থেকে রক্ষা পায়।

৩। গ্যামেটোসাইট দশা (gametocyte stage): শুধু খেয়েদেয়েই শান্তি নেই, এবার ম্যালেরিয়ার পরজীবীরা বংশবিস্তার করতে শুরু করে। গ্যামেটোসাইট মানে হল জননকোষ। পুরুষ এবং স্ত্রী গ্যামেটোসাইট, উভয়েই ম্যালেরিয়া রোগীর রক্তে তৈরি হয়। ম্যালেরিয়া রোগী নতুন করে মশার কামড় খেলে রক্তে থাকা এই গ্যামেটোসাইট আবার মশার মধ্যে প্রবেশ করে। মশার দেহের মধ্যে পরজীবীর যৌন জনন (sexual stage) শেষ হলে উৎপন্ন হয় নবজাতক, যা আবার সেই মশার কামড়ে অন্য মানুষের শরীরে প্রবেশ করে।

কুইনিন যৌগ কোথায় বাধ সাধে

তাহলে দাড়ালো এই যে, ম্যালারিয়ার পরজীবীকে আটকাতে হলে এই দশাগুলির কোনো একটাকে সফল হওয়া থেকে আটকাতে হবে। এখনও পর্যন্ত সব থেকে সফল অ্যান্টি-ম্যালেরিয়াল ওষুধগুলি, যেমন ক্লোরোকুইন, মেফ্লোকুইন, ইত্যাদি পরজীবীদের রক্ত দশাকেই আক্রমণ করেছে। ক্লোরোকুইন পরজীবীর খাদ্য থলিতে প্রবেশ করে হিম থেকে হিমোজোইন তৈরীর রাসায়নিক প্রক্রিয়াকে বাধা দেয়। পরজীবীদের ভিতরে হিম-এর পরিমাণ বৃদ্ধি পায়, আর এই হিম-এর বিষক্রিয়ায় তাদের মরতে হয়।

আর এইখানেই যত বিপত্তি। কিছু পরজীবীর এমন পরিবর্তন ঘটেছে যে তারা ক্লোরোকুইনকে নিজেদের খাদ্যথলির ভিতর জমতেই দেয় না। ফলে তারা দিব্বি বেঁচে-বর্তে থাকে। শুধু ক্লোরোকুইন নয়, আরও কিছু অ্যান্টিম্যালেরিয়াল ওষুধকেও একই সাথে প্রতিরোধ করতে পারছে ওই সব মাল্টিড্রাগ রেসিস্ট্যান্ট (MDR) পরজীবী।

আর এখানেই আরটেমিসিনিনের এর গুরুত্ব, কারণ আরটেমিসিনিন এইসব প্রতিরোধী পরজীবীদের অনায়াসেই মারতে পারে। ঠিক কিভাবে আরটেমিসিনিন কাজ করে?

মুশকিল আসানকারী আরটেমিসিনিন

রাসায়নিকভাবে আরটেমিসিনিন হল সেসকিটার্পিন ল্যাকটোন (sesquiterpene lactone) নামের একটি যৌগ। কেমিকাল ফর্মুলা $C_{15}H_{22}O_5$। এর কাঠামো লক্ষ্য করলে দেখবে, ভিতরে থাকে যাকে বলে একটা এন্ডোপারক্সাইড ব্রিজ (endoperoxide bridge)। বিজ্ঞানীরা প্রমাণ করেছেন আরটেমিসিনিন এর ম্যালেরিয়া-বিনাশক ক্ষমতার জন্যে আসলে এই এন্ডোপেরক্সাইড ব্রিজ-ই দায়ী।

বিজ্ঞানীরা মনে করেন যে আরটেমিসিনিন একটা প্রোড্রাগ (prodrug) যা একবার রক্ত কণিকায় থাকা পরজীবীর ভিতরে প্রবেশ করলে, তবেই সে

একটা সক্রিয় পদার্থে পরিবর্তিত হয় এবং সেইটিই আসলে পরজীবী মারার কাজ করে।

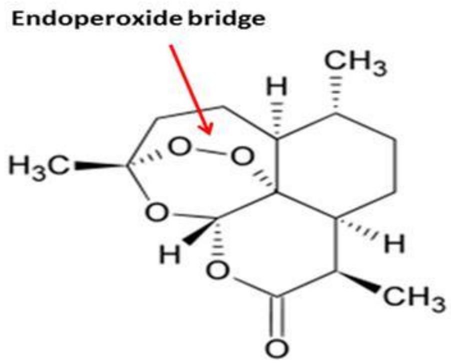

অর্থাৎ, আরটেমিসিনিন দুটো ধাপে কাজ করে। প্রথম ধাপ হলো সক্রিয়করণ বা এক্টিভেশন (activation)। সাধারনভাবে মনে করা হয় যে, পরজীবীর ভিতর প্রবেশ করার পরে আরটেমিসিনিন আয়রন (Fe^{2+}) অথবা ফেরাস হিম-এর সাথে বিক্রিয়া করে। তৈরী হয় একটা মাঝামাঝি সক্রিয় অবস্থা। দ্বিতীয় ধাপে, এই মাঝামাঝি অবস্থার পদার্থটি পরজীবীর কিছু প্রোটিনের অ্যালকাইলেশন (alkylation) করে প্রোটিনগুলোকে নিষ্ক্রিয় করে দেয়।

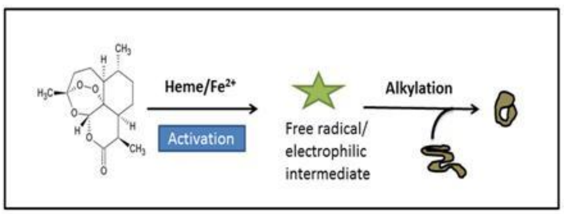

পরজীবীর শরীরে নানান রাসায়নিক প্রক্রিয়া সুসম্পন্ন করার জন্য এইসব প্রোটিনের খুবই প্রয়োজন। এদের নিষ্ক্রিয় হয়ে যাওয়ার ফলেই পরজীবীর মৃত্যু হয়। তবে আরটেমিসিনিন কিভাবে কাজ করে, সেই নিয়ে বিজ্ঞানী মহলে এখনও নানা রকম তত্ত্ব উঠে আসছে। কোনটা কতটা ঠিক, তা এখনই জোর দিয়ে বলা মুশকিল।

আরটেমিসিনিন-এর দিন কি ফুরিয়ে এলো ?

আরটেমিসিনিন কতদিন সফল থাকবে বলে তোমাদের ধারণা? আরও দশ-কুড়ি বছর? আমাদের জানা নেই। তবে তোমরা শুনলে চমকে উঠবে, বর্তমানে পাঁচটি দেশে (কাম্বোডিয়া, লাওস, মায়ানমার, থাইল্যান্ড ও ভিয়েতনাম) আরটেমিসিনিন প্রতিরোধে সক্ষম পরজীবীর খোঁজ পাওয়া গেছে। দুঃখের কথা, আমাদের হাতে মজুদ থাকা অস্ত্র দিয়ে এদের মারা যাচ্ছে না ।

ঠিক এই কারণেই আরটেমিসিনিন বেসড কম্বিনেশন থেরাপির ব্যবহার করা হচ্ছে। আরটেমিসিনিন কম পরিমাণে ব্যবহার করলে তার কার্যক্ষমতা অনেক বেশি দিন বজায় থাকবে। আর ওই আরটেমিসিনিন প্রতিরোধে সক্ষম পরজীবীদের ছড়াতে অনেক সময় লাগবে। এমনটাই বিজ্ঞানীদের অনুমান।

ভবিষ্যতে কোন ওষুধ ম্যালেরিয়া থেকে আমাদের বাঁচাতে পারবে, তা এখনই বলা সম্ভব নয়। বিজ্ঞানীদের তৎপরতায় কিছু নতুন অণুর খোঁজ পাওয়া গেছে, যা ভবিষ্যতে সফল ম্যালেরিয়ার ওষুধের জায়গা নিতেই পারে। কিন্তু এই ওষুধগুলোকে অনেক বছর কার্যকর রাখাটাই বিজ্ঞানীদের কাছে অনেক বেশী চ্যালেঞ্জিং। ম্যালেরিয়ার টীকা আবিষ্কার হওয়াটা খুবই প্রয়োজন। আর যতদিন তা না হচ্ছে, ম্যালেরিয়া-বিনাশকারী ওষুধই আমাদের ভরসা।

অতিরিক্ত তথ্য ও রেফারেন্সের জন্য দেখুন http://bigyan.org.in/2016/01/25/malaria/

(লেখাটি ২৫-শে জানুয়ারী ২০১৬ তারিখে প্রকাশিত হয়েছিল)।

প্রচ্ছদের ছবির উৎস: উইকিপিডিয়া

অঙ্কের যুবরাজ

বেদদ্যুতি চক্রবর্তী

তিনি জানতেন যে তার আয়ু আর বেশি দিন নেই। ১৯২০ সাল। দুরারোগ্য যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত হয়ে তিনি মৃত্যুশয্যায়। বয়েস তখন মোটে তেত্রিশ।

পৃথিবী থেকে চিরতরে চলে যাবার ৪ মাস আগে জীবনের শেষ চিঠি লিখছেন তাঁর 'বন্ধু শিক্ষক আবিভাবক' কেম্ব্রিজ ইউনিভার্সিটির অঙ্ক বিশারদ জি. এইচ. হার্ডি-কে। সেই লেখাতে নেই কোন মৃত্যুভয়, কোন অনুশোচনা কিংবা ঐ ছোট্ট তেত্রিশ বছরের জীবনের নানান চাওয়া-পাওয়ার কোনও হিসেব-নিকেশ। চিঠির মূল প্রতিপাদ্য ছিল অঙ্ক নিয়ে তাঁর নতুন আবিষ্কার 'মক থিটা ফাংশান'। বছর খানেক আগেই, ১৯১৯ সালে, রামানুজন অসুস্থ শরীরে লন্ডন থেকে মাদ্রাজে ফিরে এসেছেন। ১৯১৪ সালে, মাদ্রাজ ইউনিভার্সিটি-র স্কলারশিপ নিয়ে বিদেশে পড়তে যাবার আগে মাকে কথা দিয়ে ছিলেন, তিনি আমিষ ছোঁবেন না। তামিল ব্রাহ্মণ হবার জন্যে তাঁকে আরও অনেক বাধ্য বাধকতা মেনে চলতে হয়েছিল প্রবাস জীবনে। সব মিলে শারীর-টাকে উপেক্ষা করেছিলেন রামানুজন। অবশেষে দেশে ফিরে আসা। সময় যে আর বেশি নেই। জীবনের শেষ বছরে, অসুস্থ থেকেও নতুন প্রায় ৬০০ অঙ্কের ফর্মুলা-উপপাদ্য লিখে রেখেছিলেন আলাদা আলাদা আলগা কাগজে। ১৯০৩ সালে মোটামুটিভাবে মাট্রিকুলেশান পাশ করলেও কলেজ পরীক্ষাতে ফেল-ই করেছিলেন রামানুজন। হাইস্কুলে পড়ার শেষ সময়ে কোত্থেক যোগাড় করে ফেলেছিলেন জি.

এস. কার-এর সেই বইটা 'এ সিনপসিস অফ এলিমেন্টারি রেজাল্টস ইন পিওর অ্যান্ড অ্যাপ্লায়েড ম্যাথামেটিকস'! ব্যাস, ঐ বইটার ৬১৬৫ -টা উপপাদ্যই রপ্ত করার নিরলস চেষ্টায় লেগে রইলেন। কি অদ্ভুত আনন্দ! নেশা! এভাবেই আধুনিক অঙ্কের মেধায় চুপিচুপি পারদর্শী হয়ে উঠলেন রামানুজন। কলেজ পড়াকালীন, নিজেই অঙ্কের নানান ফর্মুলা-উপপাদ্য আবিস্কার করে উঠতে লাগলেন। আর সেইসব বেশির ভাগ সময়ই নোট করতে লাগলেন এখান ওখান থেকে যোগাড় করা আলগা কাগজে। খাতা কিনতে যে পয়সা লাগবে! সেই বিলাসিতা, যা কিনা রামানুজনের অঙ্কের নেশা মেটাবে, তাঁর পরিবার-এর ছিল না।

কোনক্রমে, ১৯১২ সালে, মাস মায়না ২৫ টাকায় মাদ্রাজ পোর্ট ট্রাস্ট-এ কেরানির চাকরি যোগাড় করলেন রামানুজান। ইতিমধ্যে বিয়েও করেছেন জানকী আম্মালকে। এসবের মধ্যেও তাঁর লক্ষ্য অবিচল। অঙ্ক নিয়ে আরো অনেক নতুন আবিষ্কার করতে হবে। তাঁর নিজের সেই আবিষ্কার গুলোকে সারা বিশ্বকে জানাতে হবে। না হলে আবিষ্কারের সুফল সবাই পাবে কী করে! কিন্তু কে শুনবে কলেজ ফেল করা রামানুজনের কথা? তবু তিনি চেষ্টা করে চললেন দেশে বিদেশে যোগাযোগের মাধ্যমে। ১৯১৩ সাল, রামানুজন চিঠি লিখলেন সর্বকালের অন্যতম গনিতজ্ঞ জি. এইচ. হার্ডি-কে। হার্ডি তখন লন্ডনের কেম্ব্রিজ ইউনিভার্সিটির ট্রিনিটি কলেজের অধ্যাপক। চিঠির সাথে রামানুজন জুড়ে দিয়েছিলেন তাঁরই আবিষ্কৃত অঙ্কের ১২০ টি 'থিওরেম' বা উপপাদ্য। অঙ্কের ভাষায় উপপাদ্য সেগুলোই, যেগুলো প্রমানিত। যেমন, পীথাগোরাসের সেই বিখ্যাত উপপাদ্য যেখানে প্রমানিত যেকোনো সমকোনী ত্রিভুজের অতিভুজের বর্গ, বাকি দুই বাহুর বর্গের সমষ্টি। মানে, $a^2 + b^2 = c^2$ (যেখানে c হল অতিভুজ, এবং a, b হল বাকি দুই বাহুর দৈর্ঘ্য)। এতদিন ধরে অঙ্কের নানান গবেষণায় মেতে ছিলেন প্রফেসর হার্ডি। কিন্তু, অঙ্ককে যে আবিষ্কার করতে পারে, এমন প্রতিভার সন্ধান পেয়ে আর দেরি করেননি তিনি। তাঁর সাক্রিয় চেষ্টায় মাদ্রাজ ইউনিভার্সিটি রামানুজন-কে বিশেষ স্কলারশিপের অনুমোদন দিল। সেই টাকা সম্বল করে, ১৯১৪ সালে, সাগর পেরিয়ে লন্ডন পৌঁছলেন রামানুজন। শুরু হল তাঁর অঙ্ক সাধনার আরেক অধ্যায়। হার্ডিকে সঙ্গে নিয়ে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের (১৯১৪-১৯১৮) আস্থিরতাতেও অঙ্কের আবিষ্কার থেমে থাকেনি।

সারা জীবনে প্রায় ৪০০০ অঙ্কের ফরমুলা-থিওরেম আর কনজেকচার (অনুমান) আবিষ্কার করেছেন রামানুজন। সেসবের ব্যাপ্তি ছড়িয়ে আছে 'নাম্বার থিওরি', 'ইলিপটিক ফাংশান', 'ডাইভারজেন্ট সিরিজ', 'অ্যাসিম্পটটিক অ্যানালিসিস'-সহ অঙ্কের নানা শাখা-প্রশাখায়। রামানুজন-এর আবিষ্কার আজ ব্যবহৃত হচ্ছে কম্পুটার প্রোগ্রামিং-এ, ইন্টারনেট সিকিউরিটিতে। রামানুজনের কাজের ওপর ভিত্তি করে 'অ্যাবেল প্রাইজও' (অঙ্কে নোবেল প্রাইজ দেওয়া হয় না। 'অ্যাবেল' প্রাইজকেই পৃথিবীতে অঙ্কের সর্বোচ্চ পুরস্কার হিসেবে ধরে নেওয়া হয়) পেয়েছেন একাধিক অঙ্ক-বিশারদ। ১৯১৮ সালে রামানুজন রয়্যাল সোসাইটি অফ লন্ডন-এর ফেলো নির্বাচিত হন। আমেরিকার মহাকাশ বিজ্ঞানী ও লেখক, ক্লিফোর্ড স্তোল একবার মন্তব্য করেছিলেন, সুরের ভুবনে যেমন মোজার্ট, পদার্থবিদ্যাতে আইনস্টাইন, অঙ্কের আঙ্গিনাতে তেমনি রামানুজন।

রামানুজনের এই 'অসাধারণ' জীবনকে নিয়ে প্রায় ৪০০ পাতার যে বইটা রবার্ট ক্যানিগেল

লিখেছিলেন তা হল 'দ্য ম্যান হু নিউ ইনফিনিটি'। বাংলা করলে যা দাঁড়ায়, 'সেই মানুষটা, যিনি অসীমকে জেনেছিলেন'। হয়তো সেইজন্যেই তেত্রিশ বছরের জীবন পেরিয়ে অসীমের পথে যাত্রা করতে তিনি ছিলেন উদ্বেগহীন। জীবনের শেষ সময়েও রামানুজন মেতেছিলেন তাঁর মনের মানসী অঙ্ককে নিয়ে। অসীমে পৌঁছেও তিনি মনে হয় খুঁজে চলেছেন 'পাই'-এর (π) নির্ভুল মানকে, বা নতুন কোন মৌলিক সংখ্যাকে। সেখানেই তার 'আত্মার শান্তি'।

রামানুজনের জিনিয়াস সত্ত্বার এক নমুনা – রামানুজন তখন অসুস্থ। লন্ডন-এর অদুরেই পুটনিতে (Putney) বিশ্রামরত। হার্ডি একদিন ট্যাক্সি চেপে রামানুজনকে দেখতে এলেন। সেই ট্যাক্সি-র নাম্বার ছিল ১৭২৯। হার্ডি রামানুজন-কে বলেই ফেললেন গাড়ির নম্বর-টা বড্ড বোকা-বোকা! রামানুজন-এর উত্তর ছিল – "মোটেই না বরঞ্চ ইন্টারেস্টিং। ১৭২৯-ই হল সবচেয়ে ছোটো সংখ্যা যাকে কিনা দুভাবে, দুটো সংখ্যার ঘনফলের যোগ ফল হিসেবে দেখানো যায়। ১৭২৯ = ১২^৩ + ১^৩ = ১০^৩ + ৯^৩"। বহু বছর আগে, রামানুজন ১৭২৯-এর এই চরিত্র-কে আবিস্কার করে নোটবই-তে লিখে রেখেছিলেন। ১৭২৯-এর অন্য নাম এখন 'ট্যাক্সিক্যাব নাম্বার'।

অতিরিক্ত তথ্য ও রেফারেন্সের জন্য দেখুন http://bigyan.org.in/2014/12/27/anker-yuvaraj-ramanujan/

(লেখাটি ২৭-শে ডিসেম্বর ২০১৪ তারিখে প্রকাশিত হয়েছিল)।

প্রচ্ছদের ছবি: উইকিপিডিয়া

রামানুজন ক্যালেন্ডার

- জন্ম তামিলনাড়ুর এরোডে (Erode), ২২শে ডিসেম্বর, ১৮৮৭
- বাবা কুপ্পুস্বামী, মা কমলাম্মা
- বাবার জীবিকা ছিল এক কাপড়ের দোকানে খাতা লেখার কাজ।
- মাট্রিকুলেশান পাশ - ১৯০৩ সালে
- রামানুজনের বিয়ে - ১৯০৯ সালে
- মাদ্রাজ পোর্ট ট্রাস্ট-এ চাকরিতে যোগ দেন ১৯১২ সালে।
- ১৯১৩-সালে ব্রিটিশ গণিতজ্ঞ হার্ডি-কে চিঠি লেখেন রামানুজন।
- ১৯১৪ সালে রামানুজন-এর ইংল্যান্ড যাত্রা।
- ১৯১৬ সালে, বি এ ডিগ্রি পান কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে।
- ১৯১৮ সালে, 'ফেলো অফ রয়্যাল সোসাইটি' নির্বাচিত হন।
- ১৯১৯ সালে, অসুস্থ অবস্থাতে ভারতে ফিরে আসেন।
- ১৯২০ সালে, মৃত্যু

লেখা দিতে হলে

বৈদ্যুতিন লোকবিজ্ঞান (Popular Science) পত্রিকা বিজ্ঞান (http://bigyan.org.in)-এর বিভিন্ন বিভাগগুলিতে বিষয়ভিত্তিক লেখার জন্য আমরা সকলকেই আমন্ত্রণ জানাই।

বিজ্ঞান-এ লেখা পাঠানোর আগে লেখক অবশ্যই রচনার নিয়মাবলীটি পড়ে দেখুন।

আমরা যে ধরণের লেখা পেতে আগ্রহী

- বিজ্ঞানের (ব্যাপক অর্থে – গণিত ইত্যাদি সহ) কোন ধারণা বা concept-এর সহজ এবং অভিনব ব্যাখ্যা। যা সহজে পাঠ্য পুস্তকে পাওয়া যায় না অথবা অধিকাংশ পাঠ্যপুস্তকে ভালভাবে বর্ণনা করা থাকে না। লেখকদের কাছে অনুরোধ আপনারা সাধারণ রচনাধর্মী লেখা পাঠাবেন না।
- কোন উল্লেখযোগ্য বিজ্ঞানীর জীবনের কিছু ঘটনা, যা পড়ে তাঁর গবেষণা ও তার পরিপ্রেক্ষিত সম্বন্ধে কিছু জানতে পারি। উইকিপিডিয়ার রচনামূলক ধাঁচের বদলে, কোন বিজ্ঞানীর বৈজ্ঞানিক অবদান এবং সেই আবিষ্কারের তাৎপর্যের উপর সংক্ষিপ্ত লেখাগুলো সাধারণত সুপাঠ্য ও আকর্ষণীয় হয়।
- কোন গবেষণার বিষয়ের বর্ণনা যা পাঠককে সেই বিষয়ে আরো জানতে অনুপ্রাণিত করবে। এক্ষেত্রে খুব বেশী টেকনিক্যাল টার্ম না ব্যবহার করা বিধেয়।
- নিজে কর – সহজে বাড়িতে বা স্কুলে তৈরী করা যেতে পারে বা পরীক্ষা করে দেখা যেতে পারে এমন কোন বিষয়!
- বিজ্ঞানের কোন বিশেষ সমস্যা, যা বহুদিন ধরে বিজ্ঞানীদের ভাবাচ্ছে/ভাবিয়েছে তার বর্ণনা।
- বিজ্ঞানের খবর বা বিজ্ঞানের কোন বিষয় যা বর্তমানে বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক, যেমন জলবায়ুর পরিবর্তন ইত্যাদি। এইধরণের বিষয়ে নতুন কোন আবিষ্কার বা নতুন দৃষ্টিভঙ্গী ইত্যাদি কাম্য। কেবল মাত্র সমস্যার সাধারণ বর্ণনা যা উইকিপিডিয়ায় পাওয়া যাবে তা নয়।
- বিজ্ঞান বা অঙ্কের মজার ধাঁধা।

কিছু নিয়মকানুন

- লেখাটি বিজ্ঞানভিত্তিক হতে হবে। মেটাফিজিক্স জাতীয় লেখা পেতে আগ্রহী নই আমরা।
- রাজনৈতিক বা কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে সমালোচনামূলক লেখা দয়া করে পাঠাবেন না।
- সম্পাদক মণ্ডলীর সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে বিবাচিত হবে।
- লেখাতে যথাসম্ভব বৈজ্ঞানিক তথ্যের উৎস উল্লেখ করার অনুরোধ জানাচ্ছি। এছাড়াও লেখার শেষে প্রাসঙ্গিক কিছু লেখা বা ভিডিও-র লিঙ্ক দিলে কৌতূহলী পাঠকের উপকারে আসবে।

লেখার খুঁটিনাটি

- প্রতিটি লেখা বাংলা হরফে (Unicode) Google doc ফাইল হিসেবে ই-মেল-এ জুড়ে পাঠাতে হবে। ছবির ক্ষেত্রে best possible resolution-এ পাঠাতে হবে।
- ই-মেল-এ বিষয় এবং কোন বিভাগের জন্য লেখা পাঠাচ্ছেন তা উল্লেখ করুন। সেই সাথে আপনার সম্পূর্ণ নাম এবং সংক্ষিপ্ত পরিচয় জানান।
- ই-মেল করুন bigyan.org.in@gmail.com-এ।